প্রথম প্রকাশ ঃ

মহালয়া ঃ ১৩৬৪

প্রচ্ছদ ঃ

তপন কর

মুদ্রাকর ঃ

মধুসূদন বাগচী

শ্রীপঞ্চমী প্রেস

৯, মানিকতলা লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

বুক ফ্রেন্ড

৮/১ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী

এম. এ পি-এইচ্‌-ডি. ডি-লিট্‌.

সোভিয়েট ল্যাণ্ড-নেহেরু পুরস্কার প্রাপ্ত।

"বাল্মীকির রামচরিত কথাকে
কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া
দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের
রামায়ণ বলিয়া জানিবেন।····ইহার
সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের
সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত
হইয়া আসিয়াছে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

সূচীপত্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

'ফোকলোর' শব্দটির বাংলা পরিভাষিক রূপান্তর কী হবে—লোকযান, লোকযান, লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি, লোকচর্চা, লোকবৃত্ত, লোকায়ন, লোকশ্রুতি, লোকচারণা, লোকবিদ্যা, লোকবিজ্ঞান, লোকভাষা, লোকতত্ত্ব, লোক-ঐতিহ্য, লোকলোর, লোককাহিনী ইত্যাদি—তা নিয়ে তর্ক আছে। 'ফোকলোর' কথাটিকেও পুরাপুরি গ্রহণ করতে চান কেউ কেউ। এ-নিয়ে কোন সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত হবে কিনা এবং হলেও তা কবে হবে—সে প্রশ্ন মুলতবী রেখে যদি সংস্কৃতির বিরাট ক্ষেত্র বাদ দিয়ে, সাহিত্যের অংশটুকুই বিচার করা যায়, তবে লোকসাহিত্য বলতে কোন সাহিত্যকে বুঝায়—সে বিষয়ে মতানৈক্যের বিশেষ সম্ভাবনা নেই। লেখাপড়া না জানা বা স্বল্প জানা গ্রামগুলোর বাসিন্দা, অর্থাৎ কৃষিজীবী ও গ্রাম্য শিল্পজীবী প্রমুখ মানুষ নিয়ে মোটামুটি গঠিত সমাজকে বলা যায় লোকসমাজ। এই সমাজের লোকদের জন্য, লোকদের সম্বন্ধে এবং লোকদের দ্বারা রচিত যে সাহিত্য,—তা লোকসাহিত্য। শেষেরটি এমনকি মাঝেরটি, না থাকলেও মোটামুটি চলে যায়, কিন্তু প্রথমটি অর্থাৎ লোকসমাজের জন্য রচিত—এটি থাকতেই হবে।

ছড়া, গান, কথা-গীতিকা, প্রবাদ, ধাঁধা—এগুলি লোকসাহিত্যের মুখ্য শাখা, উপশাখাও আছে কিছু। সাহিত্যের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তা প্রধানত: প্রকাশরীতির বৈচিত্র্যে। যেমন একই মাছ দিয়ে—ঝাল, ঝোল, টক—এই সব রান্নাগুলির স্বাদ আলাদা—অনেকটা সেই রকম। তা হলে বিষয়বস্তুর কি কোন গুরুত্ব নেই লোকসাহিত্যে বা সাহিত্যে; সাহিত্যের বিষয়বস্তু কী ?—মানুষ, মনুষ্য-জীবন,—একমাত্র বিষয়বস্তু বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতি, ঈশ্বর প্রমুখ সুদূর বস্তুও আমরা কল্পনা করি, আস্বাদন করি—মনুষ্য জীবনের পটভূমিকায়, মনুষ্য সম্বন্ধ বিবর্জিত কোন কিছু কল্পনা করা অনেকটা অসম্ভব। তাই, কেবল চাওয়া পাওয়া ঘর গেরস্থালির জীবন নয়, তার স্বপ্ন-কল্পনা ধ্যানধারণা সবই জীবন ও সাহিত্যের বিষয়। লোকসাহিত্যের ছড়া-গান, কথা-গীতিকা, ধাঁধা-প্রবাদ এই তিন যুগলের প্রথমটি যেন জীবনের খাপছাড়া স্বপ্ন, মধ্যটি জীবনের আবেগ রঞ্জিত কল্পনা, অন্যটি জীবনের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির দীপ্তি—তিন রঙা আলোর বিচ্ছুরণ। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একই বিষয়ের

পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখলে, লোকজীবনে সামগ্রিকভাবে তার গুরুত্ব ও প্রভাব যে বেশী সেটি অনুমান করা যায়। ছড়ায়, গানে, কথায়, গীতিকায়, প্রবাদের বিভিন্ন ধারায় বিষয় বা উপকরণ রূপে তার ব্যবহার—একটি কথাই প্রমাণ করে যে সমগ্র জীবনে এটি অপরিহার্য সম্পদ। রামকথা ও ভারতকথা বিষয় হিসাবে লোকসাহিত্যেও তেমনি একটি সম্পদ—অমূল্য সম্পদ।

ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য পরিচয় ও উৎস—বৈদিক সাহিত্য। কেবল সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদাদি নয়, ব্যাপকার্থে বৈদিক সাহিত্য বলতে—রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিও বুঝায়। ভারতীয় জীবনভাবনার আর একটি অভিজ্ঞান আছে বৌদ্ধ-সাহিত্যে। কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্চাতেই না, জীবনযাপনের বিভিন্ন ধাপেই তাদের প্রসার ও প্রভাব। ইউরোপে তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জ্ঞানী-জ্ঞানীর কাছে বৈদিক সাহিত্য পরিচিত ও সমাদৃত হয়েছে—উপনিষদাদি গ্রন্থের মাধ্যমে। এই পরিচয় অক্ষয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সীমাবদ্ধ, কারণ সর্বদেশেই বিদ্বজ্জনের সংখ্যা স্বল্প। পক্ষান্তরে মহাভারত ও রামায়ণের মুখ্যতঃ রামকথার পরিচিতি সীমা বহির্ভূত, কারণ স্বল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তার বিপুল সম্বর্দ্ধনা। সাম্প্রতিককালে—বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বালি, কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে—যেখানে ধর্মে অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধ ও মুসলমান বা অহিন্দু সেখানে রামকথার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা অপরিসীম। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব রামায়ণ উৎসব তার বড় প্রমাণ। বেদ উপনিষদ আকর্ষণ করেছে বিশ্বের বিদগ্ধ মনীষাকে, বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্ককে প্রধানতঃ—আর রামায়ণ-মহাভারত তরঙ্গ তুলেছে বিশ্বের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে, রসিকজনের চিত্তে। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক কামনা কী? পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বন্ধুজন ও পরিজন নিয়ে সুন্দর গার্হস্থ্য জীবন—মাধুর্যময় পারিবারিক জীবন। দর্শন-বিজ্ঞানের মহাকাশের যাত্রী গরুড়ের সংখ্যাও সর্বকালেই সীমিত। কিন্তু ঘর-গৃহস্থালির পরিচিত মনোরম পরিবেশে আনন্দে বসবাস করতে চায়, এমন সংখ্যাই গরিষ্ঠ। সুতরাং যে সাহিত্যে মানুষের সুখ-দুঃখের, বিরহ-মিলনের, জন্ম-মৃত্যুর তথা মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা, ঘর-গৃহস্থালির কথা আছে, সেই সাহিত্যই মানুষের কাছেই সর্বাধিক প্রিয়। ভারতকথা ও রামকথা এই কারণেই মানুষের কাছে, সকল দেশের সাধারণ সংসারী মানুষের প্রিয় বস্তু। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে

বলেছেন,—গৃহস্থাশ্রমের মহাকাব্য। কেবল ভারতের ক্ষেত্রে নয়, সর্বক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য।

রামায়ণ-মহাভারত গ্রন্থযুগল—কথা, চরিত্র, বিষয়, ভাব—সব দিক থেকেই শিষ্ট সাহিত্যের উৎস। কেবল আর্যভাষা গোষ্ঠীতে নয়, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীতেও সমান ভাবে এবং সর্বত্র এর সমাদর। কবিতা, গান, কথা, নাটক—সব কিছু নিত্যবহ নদীর মতো উৎসারিত হচ্ছে অবিশ্রাম ধারায় এই দুই মহাগ্রন্থ—হিমবাহ—রামায়ণ ও মহাভারত থেকে। আর তা শুধু শিষ্ট সাহিত্য ও শিষ্ট জীবনেই নয়, লোকজীবন ও লোকসাহিত্যকেও সমানভাবে প্লাবিত করেছে।

সাধারণভাবে লোকসমাজ বলতে যা বুঝায়—ভারতীয় জনসমাজে তাদের জনসংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ। কাজেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন ভাবনায় রামকথা ও ভারতকথার স্থান কোথায় এবং অবদান কতখানি তা ঠিকভাবে বুঝতে গেলে লোকজীবনে ও লোকসাহিত্যে তার প্রভাব কতখানি ব্যাপক ও গভীর সেটা অনুধাবন করতে হয়। কাজটি কঠিন ও শ্রমসাধ্য। ডঃ শান্তিময় ঘোষাল এই দুরূহ পথে যাত্রা করেছেন। অবশ্য তিনি প্রথমযাত্রী নন, এককও নন, তবু তাঁর বিশেষ গৌরব এই যে বিষয়টিকে তিনি গবেষণার শৃঙ্খলার মধ্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ে কিছু আলোচনা আবশ্যক। রামকথাদির মতো এক-ই বিষয় যদি শিষ্ট-সাহিত্য ও লোকসাহিত্যে থাকে এবং পর্যাপ্তভাবে থাকে—তবে তার উদ্ভব সূত্র ও কাল অর্থাৎ পূর্বাপর্য বিচার করা প্রয়োজন। বাল্মীকি রামায়ণ রসে কথায় মূল উৎস। কিন্তু অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, বাল্মীকি নিজের কল্পনা থেকে বা কোন একটি সূত্র থেকে রামায়ণ রচনা করেন নি, বহু বিক্ষিপ্ত পুরানো কথা আহরণ করে, সংকলন করে—গ্রহণ বর্জন সংস্কার করে প্রতিভার গঙ্গাজলে শোধন করে একটি অনুপম কাব্যমালিকা গ্রন্থন করেছেন। এই তাঁর মহিমা, এই জন্য তিনি আদিকবি।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলির উদ্ভব স্থান ও কালের হদিস পাওয়া যায় কি-না। আচার্য ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নয়, বহির্বিশ্বের নানা ক্ষেত্র থেকে এই সূত্রগুলির অনুসন্ধান করেছেন, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা নাম সাদৃশ্য সর্বত্র পাওয়া না গেলেও মূল কাহিনীর ছায়া দেখেছেন বিশ্ব-জোড়া রূপকথায়, লোককথায়; বাল্মীকির সংগ্রহ সীমা—নিশ্চয় অতো বিস্তৃত ছিল না, তিনি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক-লোককথা সূত্র থেকেই এই উপাদান

সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলির মধ্যেকার নানা বিরোধ-দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এক সর্বজন-গ্রাহ্য এবং তাঁর সমকালের আদর্শে গ্রহণযোগ্য সুন্দর কাব্যে রূপ দিয়েছিলেন। বাল্মীকির সংগ্রহস্থল সেই আদিম কোরকগুলি লোকচিত্তে ক্ষীণ হয়ে গেলেও শুকিয়ে যায়নি—বংশপরম্পরায় সমাজের মধ্যে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে বেঁচে আছে। লোকসাহিত্য তারই বিচ্ছুরণ। তবে এটি যে অবিমিশ্র ভাবে আছে তা মনে করার কোন হেতু নেই। কারণ উত্তরকালে রামায়ণের প্রভাব সমগ্র জনসমাজে নানা কারণে এত ব্যাপক হয়েছিল যে, তাও গড়িয়ে লোকসমাজে গিয়ে নূতন ভাবে রামকথার লোকসাহিত্য—ছড়া, গান, কাহিনী, প্রবাদ—সৃষ্টিতে প্রেরণা জোগাতে পারে। আদান-প্রদান মনুষ্য জীবনের একটি সাধারণ ধর্ম। লোকসমাজ সর্বাধিক রক্ষণশীল হলেও মানুষের ভাব ও ভাবন ধারাকে চিরকাল আটকে রাখতে পারে না। লোকসাহিত্য ও শিষ্ট সাহিত্যের পারস্পরিক তরঙ্গাঘাত ও সংযোগ খুবই স্বাভাবিক। তখনও ছিল, এখনও আছে।

রামচন্দ্র কোন ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা তা নির্ণয়ের জন্য অযোধ্যা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, খননকার্যাদি চলছে। ঐতিহাসিক বুদ্ধি পাথুরে প্রমাণ চায়। রামচন্দ্র ভগবানের অবতার কিনা—সে আর এক ধরনের জিজ্ঞাসা। কিন্তু মাটির নীচে খুঁজে যা কিছু পাওয়া যাক—তা দিয়ে ভারতীয় জনচিত্তের অভ্যন্তরে যে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা আছেন তার কোন ইতর বিশেষ হবে বলে মনে হয় না। লোকমানসে স্বতঃউৎসারিত যে সব ছড়া, গান, কথা—লোকসাহিত্য আকারে আছে সেগুলি খুঁজে বার করলে, তার বিভিন্ন মুখী বিচার-বিশ্লেষণ করলে কেবল ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক প্রমুখ খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের নয়—রামচন্দ্রের একটি সমগ্র রসমূর্তির, সাহিত্য শিল্পসম্মত প্রিয় মূর্তির আবিষ্কারের ও আস্বাদনের পথ সুগম হয়। ডঃ শান্তিময় ঘোষাল এ কাজ সানন্দে করেছেন,—এপথে আরও বহু দূর যাবার, বহু তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে।

আরও একটি বিষয় সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে, বাংলাতে রামকথা ও ভারত-কথা কেবল কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসই করেন নি, বহু কবি নানা কালে নানা অঞ্চলে খণ্ডভাবে বা সম্পূর্ণভাবে রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ তথা রচনা করেছেন। প্রত্যেকের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও বাংলা রামায়ণ-মহাভারতে কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। ডঃ শান্তিময় ঘোষাল অন্যান্য রামায়ণ-মহাভারত বাদ দিয়ে, কেবল প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা দুইখানি কৃত্তিবাসী

রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত গ্রন্থ যুগল অবলম্বন করে তাঁর যুক্তি, যা আগে বলা হলো, তাও দিয়েছেন। ডঃ ঘোষাল দেখাতে চেয়েছেন, জনপ্রিয় রামায়ণ মহাভারতে রামকথা ভারতকথার যে উল্লেখ আছে, তা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে কিভাবে বিস্তৃত, তাদের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য কোথায়। তাঁর সীমা নির্দিষ্ট, বক্তব্য পরিষ্কার।

কিন্তু এই ধারাটির সামগ্রিক বিচার আবশ্যক। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন কালে যে সব রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছে,—তার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বহু তথ্য অবশ্যই পাওয়া সম্ভব। এটি একটি অবশ্য করণীয় কাজ। ডঃ ঘোষাল এই সমগ্র বৃত্তটি নিয়ে কাজ করবেন কিনা জানি না, তবে এদিকে নূতন গবেষকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

'বাংলা লোকসাহিত্যে রাম ও ভারতকথা' গ্রন্থখানি পাঠকগণ পড়ে আনন্দ পাবেন, অনেক নূতন জিনিস যা চেনা অথচ যেন অজানা এমন বিষয়ের সন্ধান পাবেন। নিজ নিজ রুচি অনুসারে তার মূল্যায়ন করবেন পাঠক সমাজ। এই জাতীয় আলোচনা ও গবেষণার গুরুত্ব ও সহজ তাৎপর্য বুঝতে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বুদ্ধির প্রয়োজন আছে বলে অনেক মনে করেন। যেমন উচ্চাঙ্গ কালোয়াতী সঙ্গীতাদির রসাস্বাদনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পরিশীলিত মনের আবশ্যকতা আছে। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা ডঃ ঘোষালের লিখন শৈলীর মধ্যে গবেষকের লেখনীতে প্রত্যাশিত জটিলতা ও গাম্ভীর্য কিছুমাত্র নেই। তিনি গল্প-উপন্যাস নাটকাদি রচনা করে বাঙালী পাঠক সমাজে পরিচিত হয়েছেন, সাহিত্যিক রূপে খ্যাতিও পেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানির রচনা কৃতিত্ব সেই রস-সাহিত্য সৃজনের কলমে গবেষণা নিবন্ধ রচনা এবং সার্থক রূপে সে রচনার স্বীকৃতি পাওয়া।

শ্রীমান শান্তিময়ের সঙ্গে, তাঁর সাহিত্য প্রয়াসের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। কোন ব্যবসায়িক বা বৃত্তিগত উন্নতির প্রত্যাশায় তিনি সাহিত্য অনুশীলন করেন না—একান্ত প্রীতি বশেই সারস্বত সাধনায় মগ্ন আছেন এবং অকপটে শারীরিক ও মানসিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে দেবীর অর্চনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বহু উপাদান নিজে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে সংগ্রহ করেছেন তিনি। কোন দলবদ্ধ শিল্পী শৃঙ্খলার অন্তর্গত হয়ে নয়, একা একা। নেশার বশে। নেশা মানে আসক্তি, অনুরক্তি। এই অকৃত্রিম অনুরাগের সঙ্গে কিছুটা জন্মগত প্রতিভা ও পরিশীলন যুক্ত হয়ে তাঁর লিখন রীতিকে ঋজুতা দিয়েছে। নব্য লেখক-

দিগের প্রতি নিবেদন প্রবন্ধে (প্রচার, ১২১১, মাঘ) বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—"সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব, সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।"

ডঃ শান্তিময় ঘোষালের সাহিত্য সাধনায় এই অলঙ্কারের সম্ভার সুস্পষ্ট।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী
ভূতপূর্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অধ্যাপক,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত। গ্রন্থ দুখানির অন্যতম পরিচয় কাব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে মহাভারত Great epic.

এই মহাকাব্য দুখানির কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণের মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের শাশ্বত প্রতিচ্ছবি ও আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। রামায়ণকে এক কথায় গার্হস্থ্য জীবনের মহাকাব্য বলা হয়, আর মহাভারতকে কেন্দ্র করে 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে' প্রবাদ বাক্যটি গড়ে ওঠার মূলে মহাভারত সম্পর্কে এ-দেশের মানুষের ধারণাটি প্রতিফলিত হয়। এক কথায় বলা যায় যে, ভারতবর্ষের সমগ্র ধ্যান-ধারণা সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম এই মহাগ্রন্থে বিধৃত হয়ে আছে।

বাল্মীকি ও ব্যাস এই দুই মহান ব্যক্তির নামে প্রচলিত মহাকাব্য দুটি সম্পর্কে বলা যায় যে, মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাসদেব কোনও ব্যক্তি বিশেষ নন, সমগ্র জাতির সম্মিলিত সৃজনী প্রতিনিধি। রামায়ণ সম্পর্কে বলা হয়, রামায়ণ রচিত হওয়ার পূর্বেই এই বিশাল ভারতে রামকথা প্রচলিত ছিল। রাম-কাহিনীর বিবর্তনের মধ্যে সমগ্র ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস পল্লবিত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল। রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্ব সূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।"[১]

ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে রামায়ণ ও মহাভারতের বিশিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই দুই মহাগ্রন্থে এ'দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-কথা ও ধর্ম একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই দুই মহাকাব্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির মহাকোষ রূপে গ্রহণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে' বলেছেন, "ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।"[২]

উৎসের দিক থেকে এই দুই মহাকাব্যের মূল কাহিনী বৈদিক অথবা পরবর্তী প্রাকৃত পালি যুগের।

রামায়ণ ও মহাভারতের রচনার সময়সীমা সম্পর্কে পূর্বাপর মতের অনৈক্য আছে। প্রচলিত ধারণায় রামায়ণ ত্রেতা যুগের ও মহাভারত দ্বাপর যুগের। অনেকে মনে করেন, মহাভারতের কিছু অংশ সম্ভবত রামায়ণের পূর্বে রচিত হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য :

"রামায়ণ ও মহাভারত যে আকারে আমরা পেয়েছি তাতে কিন্তু রামায়ণকে প্রাচীনতর বলা যায় না।" ৩

মধ্যযুগের আর্যসংস্কৃতির রূপরেখা এই দুই মহাকাব্যে লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে দেবমহিমায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন বাল্মীকি।

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥"

আদিকাণ্ড। (২।৩৬)

রামায়ণ কথায় একদিকে সুমহান কর্তব্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, অপরদিকে ভাবের স্বর্গীয় মাধুর্য। এ কাব্যে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রজাবাৎসল্য একত্রে সন্নিবেশিত। আর মহাভারতে বিশাল ভারতবর্ষের সমাজ জীবন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধর্মনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, প্রকৃতি, এককথায় সমগ্র ভারতের পরিচয় গ্রথিত হয়েছে। কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন,— "মানুষের প্রাণ, মন, আত্মা—এই তিনের মিলিত চিত্র এই মহাকবির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে।"৪

মুদ্রণ যন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে পুঁথি আকারে এই দুই মহাগ্রন্থের প্রচার অব্যাহত ছিল। বাংলায় অনূদিত মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে কৃত্তিবাস ওঝা ও কাশীরাম দাস শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। লিপিকরণের ব্যাপারে—নানা প্রমাদ, প্রক্ষেপ, বিশেষ করে লিপিকারগণের কবিপ্রতিভার অধিকারী হওয়ার জন্যও নানা সংযোজন, অজ্ঞাতসারে প্রক্ষেপন এই দুই মহাকাব্যের প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের বর্তমান রূপটি বহু শতাব্দীর ও বহু কবির সমন্বিত রূপ ; জনপ্রিয় গ্রন্থমাত্রেরই এই পরিণতি। আর এ জন্যই ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত মহাকাব্যে এত অমিল।

ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রাদেশিক সাহিত্যই রামকথার ও ভারতকথার অমৃত স্পর্শে সমৃদ্ধতর হয়েছে। ভারতীয় ভাষায় অনূদিত রামায়ণগুলির মধ্যে বাংলায় কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরাম পাঁচালি, তামিল (কম্বন রামায়ণ), কানাড়ী (পম্পা রামায়ণ), হিন্দী (তুলসীদাসী রামায়ণ), অসমীয়া (মাধব কন্দলী), কাশ্মীর (রামাবতার কৃষ্ণ প্রকাশরাম), মালয়ালম (রামচরিতমচিকুমল ও

অধ্যাত্ম রামায়ণ), মারাঠা (ভাবার্থ রামায়ণ একনাথী), উড়িষ্যা (বলরাম দাস-রামায়ণ), তেলেগু (রঙ্গনাথ রামায়ণ ও ভাস্কর রামায়ণ), গুজরাটী (রামলীলা), তোরবে রামায়ণ (করত রামায়ণ) প্রধান।

সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশেও রামকথার বিস্তৃতি ঘটেছে। ফলে কাহিনীর মধ্যে নানা পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়।

জনপ্রিয়তায় ও প্রসারের জন্য বাংলা লোকসাহিত্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাব সর্বাধিক। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় এই দুই মহাগ্রন্থের প্রভাবকেই মুখ্য স্থান দেওয়া হল। লোকসাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্য-ভূমণ্ডলের জলভাগের সঙ্গে তুলনীয়। এখনও পৃথিবীর প্রায় আশি ভাগ মানুষ বাস করে গ্রাম্য প্রকৃতির শান্ত শীতল অঙ্গনে। ভারতবর্ষে পল্লীবাসীর সংখ্যা আরও বেশী। লোকসাহিত্য মূলতঃ নিরক্ষর পল্লীবাসীর নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক। গ্রাম্য মানুষের জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিজ্ঞতায় পাওয়া লোকজীবনের লোকগাথা—লোকসাহিত্য। কথা-কাহিনী, গান, প্রবাদ, ছড়া—সর্বদিকে গ্রাম্য মানুষের লোকসংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যম এই লোকসাহিত্য। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কথা ও কাহিনী এই লোক-সাহিত্যের আঙ্গিনায় স্থান লাভ করেছে। আবার লোকসাহিত্যের অনেক প্রাচীন প্রবাদ, লোককথা এই দুই মহাকাব্যের কবিগণকে প্রভাবিত করেছে। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, "রামকাহিনীর বিবর্তনে অনেকগুলি স্তর লক্ষ্য করা যায় এবং এর প্রত্যেক স্তরেই যে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাপ আবিষ্কার করা যায়, তাতে সন্দেহ নেই। আর এই বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে ভারত সংস্কৃতির যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, আধুনিক কালে আমাদের সত্যদৃষ্টিলাভের পক্ষে তার গুরুত্ব কম নয়।"[৫]

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যেই ভারতের সনাতন ভাবধারা নিহিত আছে। ভারতবাসীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আদর্শ এই ভাবধারায় প্রভাবিত। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য। এই দুই মহাকাব্য হিমালয় ও গঙ্গার মতই ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। আমাদের অতীত ঐতিহ্য, যুগ-যুগান্তরের সাধনার বাণী এই মহাকাব্যদ্বয়ে বিধৃত হয়ে আছে। রামায়ণ-মহাভারত কেবলমাত্র মহাকাব্য নয়, এ কাব্য-কাহিনী ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। এই ইতিহাস মহাভারতের যুগের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

বাংলায় অনূদিত মহাকাব্য দুটির মধ্যে মহাভারতের কাহিনী ও জীবন

দর্শনগত বৈশিষ্ট্য অনুবাদে রক্ষিত হয়নি। মধ্যযুগের ধ্যান-ধারণা ও জীবন-ভাবনা নিয়ে বাংলায় মহাভারতের বিপুল, মহান্ ও বৈচিত্র্যময় জীবনের নানারূপ চরিত্র-চিত্রণ আয়ত্ত করা সে যুগের কবিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহাভারতের শিল্পগত তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অনুধাবনের প্রচেষ্টাও সে যুগে লক্ষিত হয়নি। স্থান ও কালের ব্যবধানে তা করা সম্ভব নয়।

এইসব অনূদিত বাংলা কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষ করে খণ্ডকাহিনীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম-ভাবনার প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মহাভারতের অনুবাদের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। চৈতন্যোত্তর যুগে অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে বৈষ্ণব ভাব-ব্যাকুলতা ও কৃষ্ণভক্তির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা মহাভারতে 'দাতাকর্ণ' ও 'শ্রীবৎসচিন্তা' একেবারেই নতুন। এ কাহিনীগুলিতে বাঙালী মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। বাঙ্গালী কবিরা শ্রীকৃষ্ণের হাতের পাঞ্চজন্যের পরিবর্তে বাঁশী তুলে দিতে কুণ্ঠিত হননি। শৃঙ্খধর্মী কাব্যকে করা হয়েছে গৃহধর্মী। মহাকাব্যকে রূপায়িত করা হয়েছে আবেগপ্রধান গল্পসমৃদ্ধ গাথা কাব্যে। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রভাব সংস্কৃত মহাকাব্যকে বহুলাংশে করেছে লোকগাথায় রূপান্তরিত। মহাক্ষত্রিয় মহাবীর রামচন্দ্র বাংলার শ্যামল প্রকৃতির প্রভাবে ভক্তবৎসল মানুষে, কোমল প্রেমিকে রূপান্তরিত হয়েছেন। যুগ সম্মুচিত ভাবনার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের দৃঢ়পিনদ্ধ মহাকাব্যিক শিল্পকলাও ক্রমশ শিথিল হয়ে সহস্র কাহিনীতে ভেঙ্গে পড়েছে। বাংলার জল-হাওয়া-মাটির মতই তার মহাকাব্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আপন কোমল মানসিকতায় বাঙ্গালী তার জাতীয় মহাকাব্যদ্বয়কে রূপান্তরিত করেছে আপন বিশিষ্টতায়। অযোধ্যার বীর রামচন্দ্রকে করেছে ভক্তবৎসল স্নেহপ্রীতির আধার। আর সুদর্শনধারী বাসুদেব কৃষ্ণকে প্রেমিক গোপাল কৃষ্ণে পরিণত করতে বাঙ্গালী কবি দ্বিধা করেন নি।

চৈতন্যপূর্ব আদি-মধ্য যুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে লোক-জীবনকে সন্নিহিত করে তোলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় কৃত্তিবাস ও মালাধরের রচনার মধ্যে। রামায়ণে অভিজাত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মিলন সাধনের যে সাধারণ সূত্র উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তার একান্তই অভাব। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লোকায়ত গার্হস্থ্য জীবন রসের নানা উপাদান লোকসংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। কবিকুল রঘুপতি রাজারামকে পতিতপাবন 'সীতারামে' পরিণত করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের তুরীয় মহিমা লৌকিক সংস্কৃতির স্পর্শে রাধাশ্যামে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের আর্যবীর পার্থ',

রাজবৃত্তের সংগ্রামী ইতিহাস তার লৌকিক রূপায়ন বা লোকবৃত্তের মধ্যে তার সহজ স্বীকরণ প্রথম দিকে সহজ সাধ্য হয়নি। বাংলায় লোকসমাজে যে লৌকিক কৃষ্ণ বৃন্দাবনী লীলায় মত্ত ছিল, সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাসের প্রতিভার দাক্ষিণ্যে, সেই লৌকিক কৃষ্ণের সার্থক প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল লোকসংস্কৃতি ও আর্য-সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে।

রামকথা-ভারতকথা পরিবৃত হয়ে আছে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে, তার বিরাট পটভূমির অফুরন্ত বৈচিত্র্যময়তায়। গ্রাম্য নিরক্ষর কবির তাঁর আপন পরিবেশে আপন কবিপ্রতিভার গুণে লোকসাহিত্য রচনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাত্রাগান, পাঁচালি, কথকথা প্রভৃতির মাধ্যমে তা পরিবেশিত হয়। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে রামকথা, ভারতকথা গীত হয়। এই রামকথা ও ভারতকথা বাংলার সাধারণ মানুষকে যে কি পরিমাণ প্রভাবিত করে তা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তার প্রতিফলন থেকেই উপলব্ধি করা যায়। লৌকিক কবি ছড়া রচনা করেন, মা তাঁর আদরের সন্তানকে ছড়া আবৃত্তি করে ঘুম পাড়ান, বিয়ের অধিবাস হয়, কন্যা পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বিদায় নেয়, গ্রামের কুমারী বালিকা টুসু পূজা করে, ব্রতের ছড়া কাটে। বচন-প্রবচন, নীতিকথা, মুসলমান সমাজে আলকাপের ছড়া, সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র কবির লড়াই—ছড়ার এমন কোনও বিভাগ নেই যেখানে রামকথা ভারতকথা স্থান করে না নিয়েছে।

বাংলাদেশ গানের দেশ। এই বাংলার লোকসঙ্গীতের সব অঙ্গেই ভারতকথা-রামকথা স্থান পেয়েছে। গ্রাম্য কবি লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে নতুন রাম-রসায়ন সৃষ্টি করেছেন। ভারতকথার নতুন কাহিনী কবি আপন প্রতিভা বলে লোকসাহিত্যে সংযোজন করে লোকগীতিকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন। সঙ্গীত ভিন্ন লোকসাহিত্য অপূর্ণ। এই সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে—ব্রতের গান থেকে শুরু করে গর্ভকালীন সঙ্গীতে রামকথা ও ভারতকথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহারিক সঙ্গীত—বিয়ের গানে বরকে 'রাম' নামে আদর করা হয়। 'সীতা' গ্রাম্য বধু, অযোধ্যা নগরীর রাজকুল বধূ সে নয়, সে অতি সাধারণ মেয়ে। চাষের গান, সারি গানে, পটুয়ার গানে, কুষাণ গানে, রামলীলায়—কোথায় রামায়ণ নেই। 'ছৌ' নাচের পরিকল্পনা মুখ্যত রামায়ণকে কেন্দ্র করে। কুষাণ গানের মূল কথা লবকুশের কাহিনী। বোলান, ঝুমুর, ঘেঁটু সর্বত্রই রামকথা-ভারতকথার নবরূপায়ণ।

বাংলা লোকসাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ বিশেষ চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে লোককবির গান রচনায় প্রবণতা বেশী। যেখানে কাহিনী বা চরিত্রের

মধ্যে কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শ পান, সেই সেই চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে আঞ্চলিক কবি বিশেষ পদ্ধতিতে লোকসঙ্গীত রচনা করে গান গেয়ে চলেন।

ধাঁধা-প্রবাদ লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সম্পদ। ধাঁধা-প্রবাদের মধ্যে লোকসাহিত্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রবাদকে বলা হয় ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল। রামকথা-ভারতকথার অনেক অংশই মানুষের অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণ হয়ে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের স্তর অতিক্রম করে লোকসাহিত্যে স্থান গ্রহণ করেছে অথবা প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদ রামকথা, ভারতকথা ও মঙ্গলকাব্যে অন্তপ্রবিষ্ট হয়েছে।

কেবলমাত্র প্রবাদে নয় বাউল-গাজন-পাঁচালি প্রভৃতি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে লৌকিক গোপাল কৃষ্ণ ও লৌকিক রাম স্থান পেয়েছে। বাংলা দেশে আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবের বাইরে যে লোকসংস্কৃতি সংহত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যেখানে ব্রাহ্মণ্যাশ্রয়ী সংস্কৃতির আলো প্রবেশের অধিকার পায়নি সেখানেও লৌকিক রাম-কৃষ্ণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

যাত্রা, পাঁচালি কথকথার আকারে গীতিকাব্য বাংলার লোক-সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলার লোককবি তাঁর নিজস্ব অনুভূতির পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন লোকসাহিত্য, যে সাহিত্যে রামকথা ভারতকথা নূতন সুষমায় মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রামকথা-ভারতকথার ব্যাপ্তি ঘটেছে লোক-জীবনে—লোকসাহিত্যের সম্পদেছে,—হিমালয়ের পাহাড়-ঘেরা অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণের বনদেবতার দেউল প্রাঙ্গণে।

বাংলা লোকসাহিত্যের ভগীরথ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অমূল্য সংগ্রহশালা থেকে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করেছি। সেইজন্য প্রথমেই তাঁর কাছে ও অন্যান্য সংগ্রাহক ও গবেষকগণের কাছে ঋণ স্বীকার করি। নিজেও কিছু সংগ্রহ করে পরিশিষ্টের সংকলনে তুলে দিলাম – এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের আলোচনাকে পুষ্ট করার অভীপ্সায়।

---

১. সাহিত্য সৃষ্টি (১৩০৭) 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।
২. রামায়ণ—(১৯৩৩) প্রাচীন সাহিত্য।
৩. রামকথার প্রাক্ ইতিহাস। ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩
৪. 'অস্থিপুরাণের কথা', [illegible]। প্রঃ বিঃ ১৯৭৩। পৃঃ ১২০
৫. বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা : প্রবোধচন্দ্র সেন : সংস্করণ—১৯৭৫। পৃঃ ১৫

চৈতন্যপূর্ব ও পরবর্তী রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে মোটামুটি অষ্টাদশের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা দেশে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে সেই জনপ্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদকে অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আধুনিক যুগেও সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়েছে। মধ্যযুগে বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ বাঙ্গালী জীবনকে বিশেষ করে তার কাব্যপ্রাণকে নতুন খাতে বইয়ে দেয়। সংস্কৃত চর্চার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার ও পৌরাণিক রীতি দৃঢ়মূল হয়েছে প্রাচীন গুপ্তযুগ থেকেই। পাল-রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তথাপি তাঁরা আগম-শাস্ত্র সংহিতা পুরাণ-প্রভৃতি মহাকাব্যের প্রতি ছিলেন অনুরাগী। রামায়ণ-মহাভারত পাঠক বাঙ্গালী পণ্ডিতগণকে তাঁরা ভূমি দান করে সম্মানিত করতেন।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অভিযানে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের উপর রাজশক্তির আক্রমণে বাংলার হিন্দু সমাজ এক সময়ে একটা স্তব্ধ শীতলতায় মৌন নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। আবার খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসকগণ যখন সহযোগী ও দরদী মন নিয়ে শাসনকার্য চালাবার চেষ্টা করলেন, তখন আবার নতুন করে কিছু কিছু শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা আরম্ভ হল। প্রথম প্রায় দশ বছর তাতার-তুর্কী-পাঠানদল রণমূর্তি ধারণ করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা এ দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন, অনেকে হিন্দু কবি বা পণ্ডিতের কাছ থেকে তাঁরা রামায়ণ ও মহাভারতের অংশবিশেষ শুনতে চাইলেন। খেতাব দিতেন কাউকে কাউকে। বাঙ্গালী কবি রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ করায় উৎসাহ পেলেন। বরবক শাহ মালাধর বসুকে ভাগবত রচনার জন্য 'গুণরাজখান' উপাধিও দিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বলেছেন যে, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনতে মুসলমানেরা খুবই ভালবাসতেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকেই রামায়ণ-মহাভারতের অনুশীলন বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করেছিল। এই মিলনের প্রচেষ্টায় অভিজাত হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিবাহক মহাকাব্যদ্বয়কে লোক-ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রবল প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক কারণেই এ-যুগের কাহিনী অনেক সংযত ও বস্তুনিষ্ঠ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ 'শ্রীরাম পাঁচালি' নামে অভিহিত। ডঃ সুকুমার সেন এ যুগের দুটি অনুবাদ কাব্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর মালাধর বসুর ভাগবতকে (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) পৌরাণিক পাঞ্চালীর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এ যুগে আমরা পাঞ্চালী বা পাঁচালিকে গেয় কাব্যের অর্থেই বুঝি। অপর পক্ষে গীতের মাধ্যমে যার রূপায়ণ তাকে গীতিকাব্য বলাই শ্রেয়ঃ। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে' (১ম খণ্ড, ৩য় সং) বলেছেন, "ফর্ম-এর দিক থেকে পাঁচালি গেয় অথবা পাঠ্য আখ্যায়িকা কাব্য।"১

এই প্রসঙ্গে নিশ্চয় করে বলা যায়, কৃত্তিবাসের মত কবি নিশ্চয়ই তাঁর সুবৃহৎ অনুবাদ কাব্য লিখে রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই বিরাট জনসমাজে সেই একখানি পুঁথি নিশ্চয় ব্যাপক প্রচার হতে পারেনি—পাঁচালি গানের মাধ্যমে লোককণ্ঠ থেকে লোককণ্ঠে তা সঞ্চারিত হয়েছে দিকে দিকে। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, ৩য় সং) গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন স্বয়ং কৃত্তিবাসও ছিলেন তাঁর নিজের কাব্যের একজন গায়েন। এ অনুমানে মতানৈক্য থাকলেও একথা সত্য যে মূল কাব্যটি পাঁচালি গানের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়েছিল। বাংলার গ্রামে, গ্রামান্তরে, নগরে, গঞ্জে, আর গায়েনদের স্মৃতিশক্তিই ছিল মধ্যযুগের কবিদের সৃজনকীর্তির প্রধান ধারক। ধনীজন মাঝে মধ্যে তাঁদের প্রিয় কবির কাব্য লিখে বা লিখিয়ে নিতেন ঃ অনুমান করা চলতে পারে। এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, অনেক সময়ে মূল পুঁথির সন্ধান মেলেনি, মূলের কোন অনুলিপির অনুলিপি অবলম্বন করে নতুন পুঁথি লিখিত হয়েছে। ফলে অকৃত্রিম রচনা কেবল কৃত্তিবাসেরই হারিয়ে যায়নি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মুকুন্দরাম প্রভৃতি অনেক কবিরই মূল রচনার অনেক অংশই যে কালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে —তাতে সন্দেহ নেই।

১২শ—১৪শ শতাব্দীতে পাঠান-শাসনে বাংলার হিন্দু সমাজে যে ভাঙন ধরেছিল, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে ও সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে হলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের আদর্শ-নীতি-তত্ত্ব-কাহিনী পুনঃ প্রচারের আবশ্যকতা সে যুগের সমাজ-নেতারা বিশেষ করে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁরা আরও উপলব্ধি করেছিলেন, হিন্দু-সমাজের সর্বস্তরে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে পৌরাণিক সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারতের বহুল প্রচার আবশ্যক। তাই তাঁরা এই সব পৌরাণিক সাহিত্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। আর একথাও স্বীকার্য যে, বাংলার সংস্কৃতির মূলে আছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য আর লৌকিক সংস্কার। অস্ট্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

আজও ছড়িয়ে আছে মঙ্গলকাব্য, ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালি প্রভৃতি লোক-সাহিত্যের মধ্যে। যার মহামূল্য কাব্যরূপ ধরা পড়ে আছে "মৈমনসিংহ গীতিকা" ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায়'।

পয়ার-ত্রিপদীতে রচিত এই সব অনুবাদ সাহিত্য সাধারণ মানুষের মানসিক ভোজের অনুকূলে খাদ্য পরিবেশনে সমর্থ হয়েছিল। বাঙ্গালী তার পৌরাণিক ঐতিহ্য আর ভাবাদর্শ আপন সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে একান্ত নিজের করে গ্রহণ করেছিল। বাংলার সংস্কৃতি তার পূর্ণ পরিণতির পথ খুঁজে পেয়েছিল এই সব অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে। অনুবাদ সাহিত্য আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মিলনের পথ উন্মোচন করে দিয়েছে।

চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে স্বাধীন কল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটে। দেবমহিমায় বৈষ্ণব বিনয় লক্ষ্য করা যায়। লিপিকারগণের লিখনে নতুন ভাবনা, যুগ-পরিবেশ, জীবন-জিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটে। নব দূর্বাদল শ্যামকে এ যুগের কবিরা দাস্য প্রেমের সাধনায় প্রণাম জানান।

ভাগবতের অনুবাদক গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্য লাভ করেন। সুতরাং চৈতন্য-জীবনভাবনা জীবনীকার ও অনুবাদকগণের রচনায় প্রেরণা দান করে। কবিরা চৈতন্যলীলার প্রেমধর্মে প্রভাবিত হয়ে কাব্য রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—"কৃত্তিবাসের যুগে চৈতন্যলীলার স্মৃতি বাঙালী মানসলোকের উপর অনপত্য অধিকার। কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে আবির্ভূত কাশীরামে প্রেমভক্তির আবেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর হইয়া যুদ্ধবিগ্রহের কঠোর সংঘাত, রাজনীতি-ধর্মনীতি তত্ত্বের যুক্তিনিষ্ঠ মনন-প্রাধান্য ও ধর্ম সংপৃক্ত জীবন-কৌতূহলের সহজ আকর্ষণ-কবিচেতনায় প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। কৃত্তিবাসে ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব কাশীরামে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া ধর্মশাসিত জীবনানুরাগকে একটি বৃহৎ স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে। বৃন্দাবন-লীলার মিলিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য হইতে মহাভারতীয় কৃষ্ণে উত্তরণই বাঙালী মানস চেতনার কৃত্তিবাস হইতে কাশীরামে অগ্রগতির নিয়ামক মানদণ্ড।"২

রামায়ণ ও কৃত্তিবাস ওঝা

বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ভারতীয় সংস্কৃতির স্তম্ভস্বরূপ। এই বিশাল মহাকাব্য সমগ্র ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল প্রতীক। ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় ঐতিহ্য, সমগ্র জাতির দৈনন্দিন জীবনের সমগ্র পরিচয়ের সঠিক মূল্যায়ণ

এই মহাকাব্যে বিধৃত। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত (বাল কাণ্ড, অযোধ্যা কাণ্ড, অরণ্য কাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কা কাণ্ড ও উত্তরা কাণ্ড) এবং ২৪,০০০ শ্লোকে গ্রথিত এই মহাকাব্য ভারতীয় জীবনে শুধু কাব্য বলেই নয়, সমগ্র ভারতাত্মার প্রতীকরূপে রামায়ণ গ্রন্থের মর্যাদা সর্বত্র এবং সর্বযুগে স্বীকৃত হয়েছে। রামকাহিনীকে অবলম্বন করে বাল্মীকি ছাড়াও আরও অনেক কবি কাব্য লিখেছিলেন। কিন্তু রচনার উৎকর্ষের জন্য বাল্মীকির মহাকাব্য কালজয়ী হয়েছে। বাল্মীকির আগে ক্ষত্রিয় বীর রামচন্দ্র ও দ্রাবিড়রাজ-রাক্ষসেন্দ্র রাবণের বিরোধ নিয়ে অনেক উপকাহিনী প্রচলিত ছিল। বাল্মীকিই সর্বপ্রথম সেই উপকথাগুলিকে নিজের অপার্থিব প্রতিভার দ্বারা মহাকাব্যে উন্নীত করেছেন।"৩ আদি যুগে রামায়ণ ছিল যুদ্ধের কাব্য। রামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার, তিনি অনার্য আধিপত্য খর্ব করে দক্ষিণ ভারতে আর্য অধিকার বিস্তারে সহায়তা করেছিলেন। পরে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রামায়ণ-কাহিনী নানা যুগে ভারতীয় মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। পরে যখন প্রাদেশিক ভাষার জন্ম হল, তখন প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ অনুবাদের মধ্যে কম্বনের তামিল রামায়ণ, তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ (রামচরিত মানস) এবং বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সাধারণের মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

তুলসীদাসী রামচরিত যেমন সমগ্র উত্তর ভারতে জন-মনে পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মগ্রন্থ, তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমগ্র বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করে তার মনের মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাংলার জাতীয় কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা শ্রীরাম পাঁচালি রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। কৃত্তিবাস এই মহাকাব্য রচনা করে শুধু যে নিজে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছেন তা নয়, সুদীর্ঘকাল ধরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর মনে যে পরিমাণ আনন্দ সুধা বর্ষণ করেছেন, তা অন্য কোন বাঙ্গালী কবির দ্বারা সম্ভব হয়নি।

ষোড়শ শতকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা কেবল যে জয়ানন্দের মতো কবিগণই জানতেন তা নয়, রামায়ণ-কথা সে যুগে প্রায় সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। ষোড়শ শতকের অপর একজন বিখ্যাত কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য-ভাগবতে লিখেছিলেন—

"যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘু-নন্দনে
নির্ভয়ে শুনিলে তাহা কান্দয়ে বদনে।

আর, যবনেও যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজো হেন রাঘবেন্দ্র-প্রভুর চরণে॥"

কৃত্তিবাসের কাব্যের এরূপ প্রতিষ্ঠা শতবর্ষের কম সময়ে সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, চৈতন্য-পূর্ব যুগে কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ পাঁচালি রচনা করেছিলেন, আর এ-থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর আবির্ভাবকাল চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে।

"প্রতিভাশালী কবি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি' সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অন্তরে যে ভাবে সুচিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে, তার অনেক বৎসর পরে একমাত্র তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' ছাড়া পূর্ব-ভারতের আর কোন কাব্য এমন ভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাংলা দেশে মধ্যযুগে যে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়েছে, ভাগবত, মহাভারত, পুরাণের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য বৈষ্ণব ও শাক্ত-পদাবলী, মহাজন জীবনী ইত্যাদি, নানা শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর বিশেষ ধরনের মনোভাব ধরা পড়লেও রামায়ণকে বাদ দিলে এমন একখানি গ্রন্থও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা কালের সীমা ছাড়িয়ে বাঙ্গালীর চিরন্তন মানস-প্রবণতাকে ধারণ করেছে, অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য একটা বিশেষ যুগ বা অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যে এরূপ অখণ্ড জনপ্রিয়তা বাংলা দেশের অন্য কোন কাব্য লাভ করতে পারেনি। এই বাংলার মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় ইংরাজী ভাবনায় দীক্ষিত সমাজকে বাদ দিলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে পরিচয় নেই, এমন বাঙ্গালী খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবিকা ও জীবিকা বহির্ভূত মানসিক ঐতিহ্যের সমস্ত পর্যায়ের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। প্রবচনে, প্রাত্যহিক জীবনে সুখে-দুঃখে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের আত্মার খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করে নিয়েছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবি কঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র এঁদের কবিত্ব শক্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা কম নয়। কেউ-বা উৎকৃষ্টতর কাব্য সৃষ্টির অধিকারী। কিন্তু কৃত্তিবাস ছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালী কবি, প্রাচীন-নবীন উভয় যুগের বাঙ্গালীর মানসিক জীবনপ্রবাহকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জীবনের মূল সুর যেন প্রাক্তন সুকৃতি বশেই ধরতে পেরেছিলেন। বাঙ্গালী যা চেয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে সে তাই পেয়েছে। এধারণাও একেবারে খাঁটি। এতে খাদের চিকমাত্র নেই।"

রামচন্দ্র বিভীষণকে তিনযুগ অমর হওয়ার বর দিয়েছিলেন, কৃত্তিবাসও সেই অমরত্ব লাভের অধিকারী একথা বলা চলে। বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের মূল্যাদর্শের

কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি না ঘটে, বাংলা দেশে কৃত্তিবাসের প্রভাব কোন দিনই ম্লান হবে না। বাঙালী তার জাতীয় কবি কৃত্তিবাসকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে চিরকাল। কারণ শ্রীরাম পাঁচালি মিশে আছে বাঙালীর অন্তরাত্মার সঙ্গে।

কৃত্তিবাসী রচনায় এমন কোন প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি, যা থেকে কবি কর্মের কোন আনুমানিক মূল্যায়নও সম্ভব হতে পারে। কবির মূল পরিকল্পনা রূপায়ণ ও ভাষা-রীতির বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টাও অসঙ্গত মনে হতে পারে। তথাপি এবিষয়ে সাহিত্যিকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর সম্পাদিত রামায়ণের আদি কাণ্ডের ভূমিকায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের বিশেষ চেষ্টা করেছেন। তাতে প্রচলিত রামায়ণগুলির সঙ্গে তুলনা করে দেখান হয়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয়বস্তু এবং তার উপস্থাপনা পদ্ধতি বিশেষভাবে বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করেছে। কৃত্তিবাসের রচনা ছিল বাল্মীকির কাব্যের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ। ডঃ ভট্টশালী সম্পাদিত আদি কাণ্ড কৃত্তিবাস রচনার একটা সাধারণ কাঠামোর ইঙ্গিতও যদি বহন করে থাকে, তবে বলতে হয় কৃত্তিবাস ছিলেন বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগের সার্থক প্রতিভূ। পরবর্তীকালের বাংলা রামায়ণ অনুধাবন করলে দেখি কাহিনীবাহুল্য ভাবাবেগপ্রধান গার্হস্থ্য জীবন সৌন্দর্যের কোমল অভিব্যক্তি, চরিত্র চিত্রণে, কাহিনী পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতিতে একটা সকরুণ ভাবতন্ময়তাই বাংলা রামায়ণগুলিকে বাল্মীকির রচনার রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে। "কৃত্তিবাসের ছিল একটা সার্বিক আকাঙ্ক্ষা, বৃহত্তর জীবনাদর্শের মিলন-পটভূমি রচনার ঐকান্তিক ইচ্ছা নিষ্ঠাবান সারস্বত সাধকের ন্যায় কৃত্তিবাস তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই যুগাকাঙ্ক্ষাকে বাণী মুখে সঞ্জীবিত করেছেন—

"মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥
সাত-কাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল বা কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"

—এই প্রতিশ্রুতি কবি রক্ষা করেছেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে দৃঢ়-পিনদ্ধ ভাব-ভাষার মধ্য দিয়ে অমিশ্র ব্রাহ্মণ্য সাধনার সার্থক ফলরূপে লোকসমাজকে উপহার দিয়েছেন।"[৩]

মূল রামায়ণের বীর রামচন্দ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছেন। সীতা হয়েছেন বাঙালী সহনশীলা কুলবধূ, হনুমানের রামভক্তি বাংলা সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে, একথা বলতে আপত্তি নেই। পরিবর্তে বলতে হয় যে, কৃত্তিবাস আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী মানসিকতার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব বাংলা মহাকাব্য রচনা করেছেন – যা বাঙালীর মনঃপ্রকৃতির অনুকূলে রচিত এক আশ্চর্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থ তাই বাঙালীর জীবনে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। ভক্ত তুলসীদাস যেমন উত্তর ভারতে রামকথায় এক নবরূপ দিয়েছেন, কৃত্তিবাস তেমনি রাম-নামতত্ত্ব প্রচার করে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ভক্তি প্লাবনে বাংলার লোকসমাজকে প্লাবিত করেছেন। জাতীয় কাব্য বলতে যদি কোন কাব্যকে বোঝায়, যা সে দেশের বিরাট জনমণ্ডলীর দর্পণ হয়, যদি একটা জাতির অভিব্যক্তি কোন কাজে আত্মপ্রকাশ করে, তবে একথা সহজেই স্বীকার করতে হবে, কৃত্তিবাসী রামায়ন ও কাশীদাসী মহাভারত বাংলার জাতীয় কাব্য।

বাঙালীর অন্তরের ভাব প্রেরণা, ভক্তি, প্রেম, সকলি কৃত্তিবাসের কাব্যে স্থান পেয়েছে। ভক্তিরস আপ্লুত হয়ে রয়েছে সারা কাব্যদেহে। চৈতন্যদেবের ভক্তিরস যে বাঙালীর হৃদয়ের উৎস হতে উৎসারিত, তা কৃত্তিবাসই প্রমাণ করে গেছেন। কেউ কেউ মনে করেন বৈষ্ণব ভাবুকতার প্রভাব পরবর্তীকালের প্রভাব জাত। এ মন্তব্য যে অনেকাংশে সত্য তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথির উপর লিপিকারের প্রক্ষেপণ। তাছাড়া বাংলা রামায়ন রচিত হওয়ার পূর্বেই এ কাহিনী ছিল এদেশে সুপরিচিত ও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণব ভাবুকতার মূল সুর প্রেম-ভক্তি ছিল বাঙালীর অন্তরাত্মার শ্যামল প্রকৃতি। নাম-ভক্তির স্রোতে অনেক আগে থেকেই এদেশ প্লাবিত ছিল। চৈতন্যদেব সেই প্লাবনকে আরও উত্তাল করে তুলেছিলেন। কৃত্তিবাস রাম-ভক্তির দ্বারা সেই ভক্তিস্রোতকে নাম-ভক্তির খাতে প্রবাহিত করে ভূমি উর্বর করে তুলতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাই ত' বাঙালীর এত প্রিয়। এ কাব্যের প্রতিটি শ্লোক বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রতিদিনের জীবনের মর্মের সাথী কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এ কাব্যের আদি অন্তে আছে বাঙালী মানসিকতার আচরণ। উচ্চ-নীচ-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সমস্ত বাঙালীর মহাকাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তাই কালের সীমা ছাড়িয়ে আজও বাঙালীর প্রতিদিনের মানসিক ভোজ্য-পানীয় হয়ে বেঁচে আছে।

মহাভারত ও কাশীরাম দাস

রাজসভায় মহাভারত পাঠ বাংলা দেশে এক অতীত যুগের কাহিনী। বাংলায় রামায়ণ ও ভারত পাঁচালির উদ্ভবও প্রধানতঃ রাজদরবারের আওতাতেই ঘটেছিল। বাংলায় কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদ অধিকতর জনপ্রিয় হলেও তাঁর পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেও মহাভারতের অনুবাদের চেষ্টা হয়েছিল। আর সে অনুবাদের রীতিপ্রকরণ, কবিগণের নামধাম স্বরূপ প্রভৃতি নিয়ে যেরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, যে তুলনায় মূল মহাভারতের জটিলতা তেমন কিছু নয়। মূল কাহিনীকে বাদ দিয়ে নিজের কাল্পনিক কাহিনী ভারতকথার সঙ্গে যোগ করে কাহিনী কাব্যকে আরও জনপ্রিয় করার দিকেই কবিগণের সর্বাধিক লক্ষ্য ছিল। কদাচিৎ তাঁরা মূলের তত্ত্ব বর্ণনা, গভীরতা, চরিত্র-চিত্রণের দিকে নজর দিতেন। ভাবানুবাদের রীতিই সর্বত্র অনুসৃত হত। ছোট ছোট পর্বের অনুবাদের দিকেই কবিগণের নিষ্ঠা বেশী ছিল। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, সুভদ্রাহরণ, নীলধ্বজের কাহিনী ছাড়া মূল মহাভারতের তত্ত্বাংশ, জীবন দর্শন প্রভৃতি অনুবাদে কোন কবি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।

রাজসভার কাব্য মহাভারতকে সপ্তদশ শতকের কবি কাশীরাম দাস সর্ব প্রথম সাধারণ মানুষের জীবনবেদীতে প্রতিষ্ঠার অধিকার দিলেন

মহাভারতের কবি কাশীরাম দাস সমগ্র মহাকাব্য অনুবাদের পূর্বেই লোকান্তরিত হন। এ তথ্য কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের জবানীতে স্পষ্টতেই প্রমাণিত হয়।—

"শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন॥"

কিন্তু নন্দরাম কাশীদাসের মহাকাব্যের কতটুকু সমাপ্ত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কাশীরামের কাব্যের শান্তিপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব, যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বসু ও জয়ন্ত দাস রচনা করেছিলেন। জয়ন্তদেব হয়ত কাশীরাম দাসের একমাত্র পুত্র ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাবনীনাথ রাধা দামোদর সিংহের রাজত্বকালের একটি পুঁথিতে আদিপর্ব সমাপ্তির কালজ্ঞাপক একটি শ্লোক আছে। এই দুর্বোধ্য শ্লোকের ব্যাখ্যা করে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কবি ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে আদিপর্ব সমাপ্ত করেন।

কবি কাশীরাম দাস বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন। ইন্দ্রানী বা ইন্দ্রাবনী ছিল তাঁর জন্মস্থান। এটি বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অবস্থিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাগণের মতে মহাভারতের বিরাট পর্ব অনুবাদের পর কবি নীলাচলে চলে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণব চেতনার প্রেরণার উৎস নীলাচল। কাশীরাম দাসের বৈষ্ণব প্রেরণার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিনয়। দেব-বংশসম্ভূত এই মহাকবি 'দাস' উপাধিতে নিজের পরিচয় রেখে গেছেন। চৈতন্য-প্রেমে অবগাহন করে কবি কাব্যপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। সেই প্রেরণা বশেই রাজসভায় মহাকাব্যকে কাশীরাম বাঙ্গালীর লোককাব্যে পরিণত করেছেন। বাঙ্গালী জাতি মহাকবির এ দানকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি জানাতে ভোলেনি। বাংলা ভাষায় রচিত বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য 'মহাভারত' বাঙ্গালী কবির রচনা, আর এই কাব্যের প্রাণসূত্র একটি মাত্র ঐক্যের বন্ধনে বিধৃত। আর সেই একক আদর্শের স্রষ্টা মহাকবি কাশীরাম দাস। কাশীরামদাসের ভণিতায় যে মহাভারত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমাদৃত, তা বাঙ্গালীর প্রাণের-মনের-আত্মার মহাকাব্য।

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ডঃ সুকুমার সেন। ১ম খণ্ড, ৩য় সং।

২. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৮৩

৩. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। (১ম :প্রকাশ : ১৩৭৩) পৃঃ ৪২

৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা : (১ম পর্যায়) ১৯৬৫ শ্রীভূদেব চৌধুরী। পৃঃ ১৪৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলায় অনূদিত রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়ের সহিত বাঙালীর মানসিকতার সম্পর্ক নিরূপণ

রামকথা ঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে বৈশিষ্ট্য বাঙালী মানসিকতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে, বাঙালী তার জীবনের প্রতি মুহূর্তে কেন রামকথাকে আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছে, কেন সে শ্রীরামচন্দ্রকে আরাধ্য দেবতা হিসাবে বরণ করেছে, আর বাঙালীর লৌকিক জীবনে তার সাহিত্যে এত বেশী করে রামকথা কেন প্রতিফলিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে :

কৃত্তিবাসের রামকথায় ভক্তিবাদের দুটি স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে নামাশ্রয়ী রাম ভক্তিবাদ, আর অপর দিকে পরাৎপরা আদ্যাশক্তির বাৎসল্য ভাব। বাংলা দেশে চৈতন্যদেবের সমকালে আর তাঁর আবির্ভাবের পরবর্তী যুগেই যে ভক্তিআশ্রিত ধর্মে বাঙালী প্রভাবিত হয়েছিল তা নয়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাংলা দেশে কৃষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল তার ধর্মে-কর্মে-লোকসাহিত্যে। পরবর্তী কালে চৈতন্য-ধর্মের অন্তর্গত নামতত্ত্ব যা গৌড়ীয় ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়, তা কৃত্তিবাসের অনেক আগে থেকেই এ-বঙ্গে প্রচলিত ছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণে এরূপ ভক্তির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় ; কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রধানতঃ নামতত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রত্নাকর দস্যু 'রামনাম' উচ্চারণ করতে না পেরে কেবলমাত্র 'মরা' 'মরা' উচ্চারণ করেই উদ্ধার পেলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রারম্ভেই দেখি এই নামবাদ, যে নামবাদ এ-বঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হওয়ার পূর্বেই প্রচলিত ছিল। কৃত্তিবাস তাঁর অসাধারণ কবিগুণে তা বাঙালীর মনলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

লঙ্কাকাণ্ডে নিহত ভক্ত বীর বানরগণের সদ্গতি হল না। কিন্তু দুরাচার রাক্ষস-সেনার মুক্তি হল কেমন করে ? যুদ্ধাবসানের পর শ্রীরামচন্দ্র ইন্দ্রকে এই রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দেব রাম বললেন, "কপি সৈন্যেরা মৃত্যুকালে রাক্ষসরাজ রাবণের নাম উচ্চারণ করে মৃত্যু বরণ করেছে। কিন্তু রাক্ষস-সেনার মৃত্যুর পূর্বে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করে, রাক্ষস সেনারা রামনাম উচ্চারণ করার জন্যেই স্বর্গলাভ করেছে।" অর্থাৎ যেমন করেই হোক, আর যে মনোভাবের বশেই হোক 'রাম' উচ্চারণেই মুক্তি ; রাম ভক্তিবাদের এই অপূ

নিদর্শন কবির কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজেও রামনাম উচ্চারণ করে মুক্তি কামনা করেছেন।

পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাবে যে নামতত্ত্ব ভক্তিবাদের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হল, কৃত্তিবাসের মধ্যে তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই নামতত্ত্ব কৃত্তিবাসের আবিষ্কার নয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, নামতত্ত্ব তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল; এই নামতত্ত্ব বাঙ্গালীর জীবনে তার সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় একদিকে নামতত্ত্ব, অপর দিকে হনুমানের দাস্যভক্তি। বৈষ্ণব ধর্মভাবনায় দাসভাবে মুক্তির যে পথ নির্দেশিত আছে, হনুমানের আত্ম-নিবেদনে তারই স্পর্শ পাই। দাসভক্তি বাংলা দেশে এক নতুন মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। 'দাস মনোভাবকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে, প্রভু-ভৃত্যের প্রয়োজনের সম্পর্ককে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছে।'

কবি রামচন্দ্রকে প্রেমের দেবতারূপে চিত্রিত করেছেন। কৃত্তিবাসের রাম চরিত্রে কিছু কিছু বীরত্ব থাকলেও, বাল্মীকির রামচন্দ্রের মধ্যে বীরত্বের যে মহিমা লুকিয়ে আছে, অদ্ভুত পৌরুষের যে চিত্র আছে, কৃত্তিবাসের রামচরিত্র ভক্তির স্রোতে সে বীরত্ব ও পৌরুষ হারিয়ে ফেলেছে এই ভক্তিবাদ বাঙ্গালী মানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। 'বিভীষণ পুত্র তরণীসেন অঙ্গে রামনাম লিখে রামের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে রামচন্দ্র দ্বিধায় পড়লেন, ভক্তের গায়ে অস্ত্রাঘাত? সীতা উদ্ধার না করেই রামচন্দ্র ফিরে যাবেন স্থির করলেন, ভক্তের গায়ে আঘাত হানতে তিনি পারবেন না।'—ভক্তের প্রতি এরূপ আচরণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেবত্বদান করেছে। বাঙ্গালী কবি মানবপ্রেমিক রামচন্দ্রের জবানীতে শ্রীরামের মহীয়ান চরিত্র মহাকাব্যে রূপায়িত করেছেন।

"ভক্ত মোর পিতামাতা ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ॥"

ভক্ত তরণীর কাটা মুণ্ডু 'রাম রাম' উচ্চারণ করে নিত্যধামে প্রস্থান করল। আর রাবণও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শ্রীরামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রামচন্দ্রের মধ্যে নারায়ণকে দর্শন করে মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করবেন—এই আশায় ব্যাকুলিত,—মৃত্যুভয় তাঁর নেই, সমস্ত হারিয়েও রাবণ ভক্তিবাদে বিহ্বল।

রাবণের যুদ্ধযাত্রা কালে রাণী মন্দোদরী যখন রোদন করেন,—রাবণ তখন আশ্বাস দিয়ে বলেন—

"মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য বটাইতে কাছে।"

যুদ্ধকালে মহাভক্ত রাবণ রামের স্তুতি করেন, নবদূর্বা রামচন্দ্র ভক্তের ক্রন্দনে স্তম্ভিত, বিচলিত,—তিনি ভক্তকে উদ্দেশ করে বলেন,—

"কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না লইবে আর।"

যুদ্ধে রাবণ বাণবিদ্ধ। রামচন্দ্র স্থির থাকতে পারলেন না, তিনি মুমূর্ষু ভক্তের কাছে উপস্থিত হলেন, আর অন্তিমকালে রাবণ রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানালেন,—

"অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।"

এই ভক্তিবাদ বাঙালীর জীবন ও সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে আদিকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে অবতার রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি নিবেদিত হলেও, বাংলাদেশে রামায়ণে ভক্ত ভগবানের যে নৈষ্ঠিক রতির কথা বলা হয়েছে, সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণে সেরূপ আবেগ ব্যাকুল ভক্তিবাদ অনুপস্থিত। ভক্তিবাদের বৈশিষ্ট্য বাঙালীর দীর্ঘকালের সংস্কার, তার নিজস্ব কৃষ্টির, ধর্মের, মানসিকতার অঙ্গস্বরূপ, তার লৌকিক আচারে তার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় দৈনন্দিন ব্রতোপচারে অভিব্যক্ত। কৃত্তিবাস মুখ্যতঃ সেই আদি সংস্কারকেই পরিপুষ্ট করেছেন তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির দ্বারা। ভারতীয় অপর কোনও কাব্যে বা সাহিত্যে এরূপ আবেগ ব্যাকুল ভক্তিবাদ নেই। রামকথার এই ভক্তিবাদই কৃত্তিবাসকে অক্ষয় অমরত্ব দান করেছে, আর লোকজীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে রামকথাকে বাঙালী অন্তরাত্মার সাঙ্গীকরণ করে দিয়েছে। বাংলা রামায়ণের ভক্তিবাদ বাঙালী মানসিকতার অঙ্গ। কৃত্তিবাস সেই মানসিকতাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। কবির সৃষ্টি সাহিত্য যুগের সীমানা অতিক্রম করে কবিকে চিরন্তন মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

ভারতকথা : সংস্কৃত মহাকাব্যের যুগল নায়ক কৃষ্ণ ধনঞ্জয় কাশীদাসী মহাকাব্যে বাংলায় খাঁটি মানুষে পরিণত হয়েছেন। মহাকাব্যের উদাত্ত বীর্যগাথা শ্যামল নীলিমায় কোমল মধুর কাব্যগাথায় রূপপরিগ্রহ করেছে। বীর ধনঞ্জয় এখানে কোমল প্রকৃতির মানুষ। কৃষ্ণ এ-কাব্যে বাঙালীর ঘরের মানুষে পরিবর্তিত। কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসও সংস্কৃত মহাকাব্যকে আশ্চর্য নিপুণতায় বাঙালিয়ানায় রূপান্তরিত করেছেন। কাশীদাসী মহাকাব্য বাঙালীর কাছে এত প্রিয় যে, সে সংস্কৃত মহাকাব্যকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। আর এই আপন করে

লেখার নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় যে, লিপিকার তার আপন মনের মাধুর্য মিশিয়ে এই ভারত পাঁচালিকে নিজের মত করে নিতে কার্পণ্য করেনি। আর এই জন্যই কাশীরাম দাসের মহাকাব্যের কোন নির্ভরযোগ্য সংস্করণ আজও মুদ্রিত হতে পারেনি। ইতিহাস বলে কাশীদাসী মহাভারত ছিল অসম্পূর্ণ, কিন্তু বাঙালী তার জাতীয় কাব্যকে সম্পূর্ণ করে নিয়ে ঘরে ঘরে ঠাঁই করে দিয়েছে। সপ্তদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী এই ভারতকথাকে কেন্দ্র করে কত পুরাণের অলৌকিক গল্প, কত বিচিত্র গার্হস্থ্য উপাদানকে রূপায়িত করেছে নতুন করে। বিদেশী রাজকর্মীদের যুযুৎসার চরিতার্থতা বিধানের জন্য এই কাব্য অনূদিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন কবিগণ এই মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে কত ঘটনা বহুল চিন্তাধারা উপহার দিয়েছেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এই মহাকাব্য অনুবাদের পূর্বেই বাংলার লোকসমাজে ভারত পাঁচালির প্রচলন ছিল। এই ভারতকথার খণ্ড অংশ গায়েনদের দ্বারা গীত হত; কিন্তু সেই কাব্যগাথার অনেকাংশেই আদি মহাভারতের কোন সঠিক অনুসরণ ছিল না। অধুনা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মহাভারতের যে বিশেষ চল ছিল, তা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন কবির ভণিতা যুক্ত বিভিন্ন পুঁথি আবিষ্কারের ফলে। রামকথাকে বাঙালী যেমন আপন করে নিয়েছিল, সর্বশ্রেণীর বাঙালী পাঠক তেমনি মহাভারতের রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, কূটনীতি, সমাজনীতির জটিলতাকে বাদ দিয়ে, তার খণ্ড চরিত্র, ঘটনা যা বাঙালীর একান্ত পরিচিত, তাকে সে আপন হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছে। রামায়ণের মতই ভারত-কথা বাঙালী মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' কাব্য গ্রন্থের প্রস্তাবনার অংশ বিশেষ উদ্ধারযোগ্য : "মহাভারত পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈল উপত্যকায়, সেই শেখরমালায়, অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সানুদেশে সেই দৃপ্ত ভাবাতীত— ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর পতিত মানব জাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।"[১] মহাভারত পাঠে কবির ব্যক্তিগত মানসিকতার প্রতিফলন উদ্ধৃতাংশে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই মানসিকতা কেবলমাত্র কবির নয়, সমগ্র জাতির। পাঠককুল এই মর্ত্য জীবনের দৈনন্দিন গ্লানি থেকে মুক্তির দিশারী পেয়েছেন রামায়ণ-মহাভারত— এ-দুই কাব্যগ্রন্থে।

---

১. রৈবতক। ১লা ভাদ্র ১২৯৩ সন (১৮৮৭)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা লোকসাহিত্য ঃ রাম ও ভারত কথা

'লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বিভাগ' অংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, "লোক-সাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে ।।"[১] কোন আদি কালে এই লোকসাহিত্যের প্রথম জন্ম হয়েছিল, তা আজ আর অনুসন্ধান করে পাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের খাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে ।।"[২]

বাংলা লোকসাহিত্যের নিরক্ষর পল্লীকবি কেমন করে রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্যের মুখোমুখি হলেন, আর এমন অপূর্ব 'রামকথা', 'ভারত কথার' গান গাইলেন, তা চিন্তা করে বিস্মিত হতে হয়। নিরক্ষর, প্রায়-নিরক্ষর পল্লীকবিরা সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের সংস্পর্শে তো আসেননি, এমনকি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের কোন বই বা পুঁথি হয়ত চোখেও দেখেননি, তবুও তাঁরা গানে-গানে-ছড়ায়-ধাঁধায়-প্রবাদে সৃষ্টি করলেন অপূর্ব রামরসায়ণ, প্রতিধ্বনিত হল বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রভাব, আর বাঙালীর আপন সংস্কৃতির নব রূপায়ণ। লোকসাহিত্য জাতির নিজস্ব সম্পদ। যুগ যুগ ধরে নানা সংস্কৃতির বাহন এই লোকসাহিত্য। লোকসংস্কৃতির নানা ধারায় এর রূপান্তর সংগঠিত হয়েছে। আজও লোকসাহিত্যের জন্ম হচ্ছে গ্রাম বাংলার পথে ঘাটে হাটে চণ্ডীমণ্ডপে। পল্লীকবি তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা সুখ-দুঃখের ডালি সাজিয়ে ছড়া-গল্প-কথা আজও রচনা করে চলেছেন। পল্লীর জীবনসংগ্রামের সাথী এই লোকসাহিত্যে বাঙালীর সংস্কৃতির ধারাবাহিক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়।

অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় রামায়ণ ও মহাভারত এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সত্য, আর এই ধারায় সাধারণ মানুষ কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথী হয়ে কেমন করে রামায়ণ-মহাভারত লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, এই আলোচনায় তা স্পষ্টতর হবে।

আমরা জানি যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এই যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি গান আজও পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপ মুখর করে রাখে। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বাঙালী তার আপন সংস্কৃতির এই ধারায় সন্ধ্যার মুক্তাঙ্গনে আপন জীবনের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বার বার পরিচিত হয়। বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে ভুলাইট কাঁকড়াদল যে দণ্ড

পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', তাতেও আমরা 'ঝুমুর' প্রভৃতির সন্ধান পাই। এই কাব্যখানাও যে গীত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপরের রাগ ও তালের উল্লেখের মাধ্যমে। যাত্রাগান আমাদের পুরাতন সংস্কৃতির বাহন। রাধা, বড়াই ও কৃষ্ণ চরিত্রের মাধ্যমে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও যাত্রার ঢঙে গীত হত।

বাংলা লোকসাহিত্যে রামকথা ও ভারতকথার প্রভাবের প্রধানতম বাহন এই যাত্রাগান। দ্বাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলায় যাত্রাগানের প্রচলন শুরু হয়েছিল। চৈতন্য-পূর্ব যুগে কৃত্তিবাস তাঁর 'শ্রীরাম পাঁচালি' রচনা করেন। 'পাঁচালি' এই শব্দটি ব্যবহারের ফলে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঁচালির আকারে গীত হত। পাঁচালির প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে, বর্তমানে যাত্রা প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক। যাত্রা বাঙালীর যে নিজস্ব সম্পদ সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে ও আদি মধ্য যুগে যে যাত্রা অভিনীত হত, সে যাত্রা আধুনিক ঢঙের যাত্রার মত নয়; প্রভেদ আছে অনেক। সে সময়ে যাত্রায় সাধারণতঃ তিনটি চরিত্রের অংশ গ্রহণ করার কথা উল্লিখিত আছে। রামযাত্রায় রাম-লক্ষ্মণ-সীতা এই প্রধান তিনটি চরিত্র নিয়ে রামযাত্রার পালা অনুষ্ঠিত হত। রামের বন-গমন ছিল প্রধানতম ঘটনা। বাংলার জনসাধারণ সীতার বিড়ম্বিত জীবনের ব্যথাভরা কাহিনী দেখে অভিভূত হত। আপন জীবনের দুঃখময় নানা ঘটনার সঙ্গে এ কাহিনীর মিল ছিল অনেক। সীতা বাংলার গৃহবধূর নিজস্ব রূপ। অযোধ্যা নগরীর রাজবধূ সে নয়। সীতা চরিত্রের পাতিব্রত্য আজও বাঙালীর বধূজীবনের এক বিশেষ ধর্ম। বাংলার পল্লীকবি সীতার এই চরিত্রকে খাঁটি বাঙালী করে নিজস্ব সংস্কৃতির ছাঁচে নতুন রূপে রূপায়িত করে ধন্য হয়েছেন। বাঙালী কবি গ্রহণ করেছেন রামকথার নানা খণ্ড কাহিনীকে, রামায়ণের কয়েকটি বিশেষ চরিত্রকে কবি একান্ত নিজের করে নিয়েছেন।

পল্লীকবি রচনা করেন লোকসাহিত্য। রামকথা প্রভাবিত করে তাঁর মানসিকতাকে। সীতার ব্যর্থ জীবনের করুণ আর্তি লোককবির অন্তর মথিত করে।

'কথকতা' বাঙালীর প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন। চণ্ডীমণ্ডপ, যা বাঙালীর আপন সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে জড়িয়ে আছে; এই চণ্ডীমণ্ডপেই বাঙালী তার স্বাতন্ত্র্য আর জাতির ঐতিহ্য খুঁজে পায়। বাংলা-সংস্কৃতির ধারক এই চণ্ডীমণ্ডপ কথকঠাকুরের কথকতা রাম-কাহিনী ও ভারত-কাহিনী প্রচারিত, হওয়ার প্রধানতম মাধ্যম।

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥"

কথকঠাকুর যখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে ভারতকথার উপরিউক্ত শ্লোক আবৃত্তি করেন, তখন গ্রামের সকল শ্রোতা ভক্তি বিনম্র চিত্তে তার জাতীয় মহাকাব্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। কথকতার মাধ্যমে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। বাঙালী তার জাতীয় মহাকাব্যকে সমাদরে আত্মার আত্মীয় করে নেয়। এ কাব্যদ্বয়ের কাহিনী, বিভিন্ন চরিত্র স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে থাকে। পল্লীকবি সে কাহিনী নিয়ে গান রচনা করেন, কবি গান গেয়ে শোনান তাঁর প্রিয় পরিজনকে।

কথকতার মাধ্যমে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রামকথা-ভারতকথা প্রসার লাভ করে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কৃত্তিবাস ওঝা শ্রীরাম পাঁচালি আর কাশীরাম দাস ভারত পাঁচালি রচনা করেন। বাংলা রামায়ণে সীতা বাঙালীর গৃহবধূর প্রতীক, রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ বাঙালীর মায়ের কোলের ভাই। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনা বিশেষ করে সাবিত্রী-সত্যবান, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ, দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরুষ ও নারী চরিত্র গুলিকে বাঙালী তার আপন রঙে রঞ্জিত করে নিজস্ব করে নিল। পাঁচালি গায়েন রামকথা ও ভারত-কথাকে খাঁটি বাঙালীর মত করে তাঁর নিজস্ব সম্পদে রূপান্তরিত করলেন।

লোককবি যাত্রা, কথকতা, পাঁচালির মাধ্যমে মহাকাব্যদ্বয়কে নিজের করে নতুন করে রচনা করলেন। যে গান একদিন লোকসাহিত্যের সম্পদ ছিল, সে গান নব রূপে রূপান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে সম্প্রসারিত হল। রূপান্তর ঘটল। পল্লীকবি আপন কবিপ্রতিভার বলে এ কাহিনীদ্বয়ে নতুন প্রাণ সঞ্চার ঘটালেন। গ্রাম বাংলার মেঠো পথে, মেঠো সুরে এ কাব্য দুটির কাহিনী ও চরিত্র নব-রূপে পরিবেশিত হল। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় এ কাহিনীদ্বয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ল। বাঙালীর জাতীয় কাব্যকে বাঙালী কবি আপন সংস্কৃতির ধারায় অভিষিক্ত করে, আপন ব্যথা-বেদনাকে করুণ রসে জারিত করে নবতর রূপে প্রকাশ করলেন।

বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের খাদ্য-পানীয় হয়ে এ কাব্যদ্বয়ের কাহিনী লোকসাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়ে বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন দিককে পরিপুষ্ট করল।

আজও বাংলার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রামকথা ও ভারতকথার নব রূপায়ণ ঘটে চলেছে। আজও লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনা, খণ্ড-কাহিনীকে কেন্দ্র করে।

পল্লী বাংলায় আজও রামযাত্রা অভিনীত হয়। আজও কথকতা বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে কথকঠাকুর পরিবেশন করেন। আজও শ্রীরাম পাঁচালি, ভারত পাঁচালি গীত হয় বারোয়ারী পূজামণ্ডপে, গ্রামের হাটে-মঞ্চে। লোককবি আজও এ সব শুনে আপন প্রতিভার আনুকূল্যে লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেন। আজও মহরী 'বোলান' গানের কলি রচনা করেন। আজও বিয়ের রাতে গ্রাম্য-মহিলারা পাত্রের মাকে কেন্দ্র করে গান করেন, 'ওগো রামের মাগো…' ইত্যাদি। 'পাতা নাচের গান' 'ঢেঁকি-মঙ্গল' ও 'সারিগানের' তালে তালে আজও রামকথা-ভারতকথা গীত হয়।

বাল্মীকি ও ব্যাসদেব যে রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করেছিলেন, তারই নব রূপান্তর আজও বাংলার পল্লীকবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, মোহিত হয় গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ।

কোন সে অতীত যুগে আমাদের জাতীয় কাব্য রামায়ণ মহাভারত সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব আজও বাঙ্গালীর জীবনে, তার আহারে বিহারে সাংস্কৃতিক ধারায়, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে, পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তার লোকসাহিত্যের সহস্র শাখায়। সভ্য মানুষের সংস্রব নেই, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কোন স্পর্শ নেই, সরকারী কোন অনুদান নেই, তবুও পল্লীকবি আজও গান গেয়ে যান, আজও গ্রামের মানুষ সে সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়, আজও রামকথা-ভারতকথার নব নব সৃষ্টি কবিপ্রতিভার দাক্ষিণ্যে সৃষ্ট হয়ে চলেছে, এ সৃষ্টিতে বিরাম নেই একটুও।

গৌণ কাহিনী ও চরিত্রের প্রভাব

বাংলা দেশের লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এ প্রভাব এতই গভীর ও ব্যাপক যে, খণ্ড খণ্ড কাহিনী ও চরিত্র জোড়া দিলে প্রায় একখানি সম্পূর্ণ রামায়ণ ও খণ্ডিত মহাভারত রচিত হতে পারে। এই প্রভাবের প্রধানতম কারণ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের জনপ্রিয়তাই এই ব্যাপক প্রভাবের অন্যতম কারণ। কবি যখন সাধারণের মত করে কাব্য রচনা করেন, মানুষ যখন আপন জীবনের নানান

সুখ-দুঃখের কাহিনী, ব্যথাভরা ইতিহাস, নিজের অব্যক্ত অনুভূতি কাব্যে, কবিতায় প্রতিফলিত হতে দেখে, নিজের হৃদয় স্পন্দন যখন অন্য কবির কাব্যে শুনতে পায়, তখনই সে কাব্যকে একান্ত আপন করে নেয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের এ সব যে ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্ষাত্র-ধর্মের যুদ্ধকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে কাশীরাম দাসও যে সাধারণ মানুষের কথা তাঁর ভারতকথায় ব্যক্ত করেছেন, তা তাঁর জনপ্রিয়তা থেকেই প্রমাণিত হয়। এখন বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বাংলা লোকসাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের মূল কাহিনীকে উহ্য রেখে গৌণ কাহিনীর দিকেই লোককবির ঝোঁক বেশী। গৌণ কাহিনীই লোকসাহিত্যের প্রায় সবটা দখল করে আছে। মূল কাহিনীর জন্য কবি অল্প একটু জায়গা করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতেও লোককবির কার্পণ্য চোখে পড়ে।

কেবলমাত্র গৌণ কাহিনীই লোকসাহিত্যের অনেকটা জুড়ে বসে নেই, গৌণ চরিত্রও অনেকখানি আসন দখল করে আছে। গৌণ কাহিনীর মতই গৌণ চরিত্রেও লোকসাহিত্যের সৌন্দর্য, শিল্পনৈপুণ্য ও রস-মাধুর্যকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে মধ্যে একঘেয়েমি যে আসেনি তা নয়, কিন্তু এই বৈচিত্র্যহীনতা লোকসঙ্গীতের সুরের মতই মধুর। এই বৈচিত্র্যহীনতা লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

'ঝুমুর' গানে শ্রীরামচন্দ্রের বন গমনকে বড় করে দেখান হয়েছে, তাড়কা-রাক্ষসী বধ শ্রীরামের যেন সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব।

"তাড়কা মরিল বনে শ্রীরামের ব্রহ্মবাণে—
রাক্ষসী মরিল রঘুনাথে।"৩

—হাতিবাড়ী, মেদিনীপুর।

তাড়কা নিধন রামচন্দ্রের একটি প্রধানতম কীর্তি। মেদিনীপুর জেলার হাতিবাড়ী গ্রাম থেকে সংগৃহীত 'ঝুমুর' গানে তাড়কা-বধের এ কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। আবার এই হাতিবাড়ী থেকে সংগৃহীত অপর একটি 'ঝুমুর' গানে পরশুরামের কাহিনী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

"যবে দশরথ রাম-সীতা লয়ে করিল গমন
পথমাঝে পরশুরাম দিলা দরশন,
রাজা ভাবে কি হবে উপায়।
রাম লক্ষণকে নিয়ে মুনির কাছে যায়,
রাজা বড় অপায়॥

"পরশুরামের দর্পিত সোনার ধনুক ছিলিলরে—
ভাঙ্গিল কোন জন,
আমায় কহ শুনায় ॥"[৪]

—হাতিবাড়ী, মেদিনীপুর।

কেবল মাত্র পরশুরামের আবির্ভাব নয়, 'মারীচ' বাংলা লোকসাহিত্যে বিশেষ-ভাবে পরিচিত।

"তাড়কার কোঙর মারীচ নাম ধরে
বাণ খেয়ে পালায় লঙ্কাতে ॥"[৫]

—হাতিবাড়ী, মেদিনীপুর।

কেবলমাত্র 'ঝুমুর' গানেই নয়, বাংলা লোকসাহিত্যের অন্য বিভাগেও পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'টুসু' গানে 'হনুমান' বিশেষ স্থানের অধিকারী।

(ক) "সোনার লঙ্কা পোড়াল হনুমান সীতার অন্বেষণে।"[৬]

—বাঁশপাহাড়ী।

(খ) "গাছের উপর ছিলে বসি তুই কি হনুমান।"[৭]

—বাঁশপাহাড়ী।

'বিয়ের গানে' পাশা খেলার কাহিনীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

(ক) "বিনোদ মন্দিরে রাম বিনোদ বেশেতে
বিনোদ বিনোদিনী খেলা লাগিলেন খেলিতে।
খেলিতে বসিয়া সীতা ছাড়িলেন দান,
হাইর‍্যা গেলেন রামচন্দ্র লজ্জিত বয়ান।"[৮]

—মৈমনসিংহ।

(খ) "সোনার রূপার দুটি পাশা, ও পাশা খেলে ভগবান।
বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা পাশায় করে মান ॥
পাশায় হারিয়া সীতারে, সীতা কাঁদিতে লাগিল,
দুই হস্তে ধরিয়া রাম বুঝাইতে লাগিলরে,
পাশা খেলেরে ॥"[৯]

—বরিশাল।

পাশা খেলা বিয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ, স্ত্রী-আচারের অংশ। এখানে বর-বধূকে প্রতীক রামচন্দ্র ও সীতাদেবী হিসেবে গণ্য করা হয়।

সীতাহরণের কাহিনী বাংলা লোকসাহিত্যের এক বিরাট অংশ দখল করে আছে। লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে সীতাহরণের কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, আর এই কাহিনীগুলির মধ্যে মারীচ, রাবণ, হনুমান বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। "বোলান' গানের কিছু অংশ উল্লিখিত হল।

(ক) "ক্রোধেতে মারীচের কাছে চলিল রাবণ।
মারীচ বসিয়াছিল করি যোগাসন।
শুন শুন ওগো মারীচ স্বর্ণ মৃগ রূপ ধর।
সীতাহরণ করিব আমি,
একটুকু সাহায্য কর।"১০
—মুর্শিদাবাদ।

(খ) "মারীচ,—কোথায় আছ ভাইরে লক্ষণ,
রক্ষা কর আমারে।
রাক্ষস কবলে বুঝি'
প্রাণ যায় বন মাঝারে।"১১
—মুর্শিদাবাদ।

(গ) "সেই সীতা উদ্ধার করে মিতা বলিলে বানরে
লঙ্কা পারে হনুর গমন।"১২
—মুর্শিদাবাদ।

লব-কুশের জন্ম-কথা ও লবকুশ কাহিনী বাংলা লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। 'কুশাণ' গানে, 'বোলান' গানে ও 'ধাঁধায়' লব-কুশ কাহিনী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কুশান গানে প্রশ্ন ওঠে,—
"বাপে জন্ম দেয় নাই, জন্ম দিয়াছে পরে
যখন ছেলে জন্ম হইল, মা ছিল না ঘরে।"১৩
—কুলবাড়ী।

প্রবাদে আছে—কুশ থেকে কুশের জন্ম।

বোলান গানে লব-কুশের কাহিনী—
(ক) "শুনি এ লব-কুশের কথা কমললোচন।
হস্তে ধনুক ধরে বারণো বধিতে জীবন।"১৪
—চন্দ্রবিহারী, নদীয়া।

(খ) "এ সময়ে বালক দু-জন, তোমরা এখন
যুদ্ধ দাও আমার সনে,
দেখিব আজিকার রণে।"১৫

—চক্‌বিহারী, নদীয়া।

(গ) "ধনুক বাণ ধরে লব-কুশ তখন
বনে বনে করে বাণ বরিষণ।"১৬

—চক্‌বিহারী, নদীয়া।

(ঘ) "রামেরে বধিতে বাণ তার' হেন ছুটে,
কুশের ত্রৈশিক বাণ পড়ল রামের বুকে।"১৭

—চক্‌বিহারী, নদীয়া।

ধাঁধা —

।। কুশ ।।

(ক) "পিতার ঔরসে নয়, নহে মাতৃগর্ভে
তাহার জন্মকালে মা ছিল না ঘরে।
সেই দ্রব্য মহাশয় আশু প্রয়োজন,
কৃপা করে উপস্থিত করুন এখন।"১৮

—পুরুলিয়া।

(খ) "হায় বালা কি হইল
বিনা বাপে ছা হইল।
ছা হইল যখন,
মা ছিল না তখন।"১৯

—যশোহর।

(গ) "আজা হলেন জন্মদাতা,
ভগিনী হলেন মা,
ভগিনীপতি হলেন পিতা,
বুঝতে পারলাম না।"২০

—যশোহর।

উপমা আরও আছে, লোকসাহিত্যের বিরাট পরিমণ্ডলে উপমা অনেকই পাওয়া যায়। রামকথার কয়েকটি উপমা কয়েকটি বিভাগে উল্লিখিত হল। ভারতকথারও উপমা আছে। এই প্রসঙ্গে যোত্রান গানে—'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', 'হরিশ্চন্দ্র পালা' ও 'কর্ণ' প্রভৃতি খণ্ড কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা লোকসাহিত্যের—তার বিভিন্ন শাখায় রামায়ণ-মহাভারতের গৌণ কাহিনী ও গৌণ চরিত্রগুলি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ চিরদুঃখী বাংলা দেশের পল্লীকবি বৃহৎ কোন সংগ্রামের সঙ্গে পরিচিত নন, নিষ্প্রাণ জীবনে বৈচিত্র্যহীন পরিবেশে রামায়ণ-মহাভারতের বিরাট যুদ্ধকাহিনী রাজনৈতিক সংঘর্ষ, ক্ষাত্রধর্মের গৌরব গাথা সম্পর্কে খুব বেশী চিন্তান্বিত নন। আপন ছোট জীবনের ছোট গণ্ডীর মধ্যে চির করুণ কাহিনীর সঙ্গে—যে কাহিনী বা চরিত্রের মিল খুঁজে পেয়েছেন কবি, দৃষ্টিশক্তি যতদূর প্রসারিত হয়েছে, তাকেই তিনি আপন করে নিয়ে গান রচনা করেছেন।

রামায়ণ-মহাভারতে যে যে কাহিনী ও চরিত্রে গ্রামবাসী আপন আপন জীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছে, রামকথা-ভারতকথায় সেই কাহিনী ও চরিত্রকে বরণ করতে এতটুকুও কার্পণ্য করেনি। বরং সেই সেই ক্ষুদ্র কাহিনী ও চরিত্রকে কবি নিজের বেদনাময় ভাবরসে জারিত করে নবতর রূপে পরিবেশন করেছেন, সৃষ্টি করেছেন নতুন রামায়ণ ও মহাভারত।

বিশেষ বিশেষ কাহিনী ও চরিত্র বাংলা লোকসাহিত্যের অঙ্গ

বাংলা লোকসাহিত্যে রাম ও ভারত কথা সম্পর্কে আলোচনায় আমরা একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। এই বৈশিষ্ট্য বাংলা লোকসাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও চরিত্রের প্রভাব।

রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা মহাকাব্য। এই মহাকাব্য দুটির পরিধি, ব্যাপ্তি ও পটভূমি বিরাট। প্রাকৃতিক মহাকাব্যের যা যা বৈশিষ্ট্য তা সবই এ-দুটি মহাকাব্যে বর্তমান। বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিকে এ-মহাকাব্য দুটি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যে জাতির মহাকাব্য নেই, সে জাতির অনেক কিছুই অপূর্ণ; অতীত সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, সে জাতির তা নেই, একথা স্বীকার্য। কিন্তু বাংলা লোকসাহিত্যে এই দুই মহাকাব্যের বিশেষ বিশেষ কাহিনী ও চরিত্রের কেন যে অনুপ্রবেশ ঘটল, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এত ব্যাপকভাবে কয়েকটি সাধারণ কাহিনী ও চরিত্র প্রতিফলিত হল, তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়।

বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রাম ও ভারত কথার যে কয়টি চরিত্র লোককবির মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তার মধ্যে রামায়ণের রাম ও সীতা চরিত্র প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে রাম ও সীতা এই নাম দুটিই লোকসাহিত্যে

গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি, বিয়ের গানে বর ও বধূকে রাম-সীতা রূপে কল্পনা করা হয়। বাংলা লোকসাহিত্যের সঙ্গীতাংশে বিয়ের গান মেয়েলী আচার সঙ্গীতের এক বিশেষ অঙ্গ। এ-গানে বর-পক্ষ সমস্বরে ডাকে 'রাম', এ রাম অযোধ্যা নগরীর শ্রীরামচন্দ্র নন, সীতাও সাধারণ বাঙ্গালী পল্লী বধূ। বরের মাকে প্রায় গানেই রামের মা বলে কল্পনা করা হয়েছে। সীতাকে যদিও জনক-নন্দিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে, তবুও এ-সীতা সে সীতা নয়, এ সীতা অতি সাধারণ মেয়ে, আমাদের বাঙ্গালী ঘরের কুলবধূ, অথবা খাঁটি গ্রাম্য বালিকা।

রাম-সীতা চরিত্র হিসেবে বাঙ্গালীর যে কত প্রিয়, কত আপন জন, তা এই বিয়ের গানে, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানে মেয়েদের লোকগীতিতে লক্ষ্য করা যায়।

রাম-সীতাকে বাদ দিয়ে রামায়ণের অপর যে চরিত্র দুটি বাঙ্গালীর বিশেষ প্রিয়, তা লব ও কুশ। কুশকে কেন্দ্র করে কত ধাঁধাই না রচিত হয়েছে। কুশ রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর-কোমল-কঠোর কিশোর চরিত্র। বাৎসল্য প্রেমের অভিব্যক্তি এই লব-কুশের কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যেই সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

লব-কুশের কাহিনী ও চরিত্র বাংলা লোকসাহিত্যের প্রায় সব অংশেই ছেয়ে আছে। উত্তর বঙ্গের কুশাণ গান সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি ; এই কুশাণ গানকে কেন্দ্র করে যে বিরাট রামরসায়ণ সৃষ্টি হয়েছে, তা একমাত্র লব-কুশের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই ; 'বোলান' গানের বিভিন্ন অংশেও লব-কুশের কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

সীতাহরণের কাহিনী বাংলা লোকসাহিত্যের বিশেষ অঙ্গ। রাবণ চরিত্র হিসেবে বিভিন্ন গানে বিশিষ্টতার দাবী রাখে।

'বোলান' গানে শুনতে পাই—

"লঙ্কায় রাবণে বলে ভাসে নয়ন জলে কবির।
কাঁদে প্রাণের ভাই দশানন।"[২১]

—চক্রবিহারী, নদীয়া।

'টুসু' গানে মেয়েরা গায়—

"লঙ্কাপুরে রাবণ রাজা
সে করে টুসুর পূজা।
থালায় লয়ে ফুল বাতাসা
হাতে লয়ে জিলিপি গজা।"[২২]

—চক্রবিহারী, নদীয়া।

চৈত্রসংক্রান্তিতে সন্ন্যাসী 'গাজন' গানে গায়—

"রাবণের বোন সূর্পণখাই ফুল তুলিবারে যায়,
লক্ষণ ঠাকুর ধরে তাহার কান চুল কেটে দেয়।
উর্দ্ধে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে মৃগরায় পাঠাল,
সেই মৃগ ধরে আনল নারায়ণ।"২৩

—হাঁসপুকুর, নদীয়া।

বাংলা লোকসাহিত্যে কেবলমাত্র চরিত্র হিসেবে রামচন্দ্র, সীতাদেবী, লব-কুশ ও রাবণই বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি, সূর্পণখার ভূমিকাও কিছু কম নয়।

ভারত-কাহিনীর কর্ণ, রাজা হরিশ্চন্দ্র পালা, বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মহাভারতের বিপুল পরিমণ্ডলের এই ক্ষুদ্রতম অংশ লোককবি কেন গ্রহণ করলেন, রাম ও ভারত কথার বিশেষ কয়েকটি কাহিনী ও চরিত্র কেন লোকসাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান লাভ করল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি ইত্যাদি রামকথা-ভারতকথার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচিতির প্রধানতম মাধ্যম। যে কারণে রামায়ণ ও মহাভারতের প্রচার এমন সর্বব্যাপী হল, সে কারণেই রামায়ণের বিশেষ বিশেষ চরিত্র, ঘটনা ও মহাভারতের খণ্ড কাহিনী লোকসাহিত্যের কবিদের অনুপ্রাণিত করল।

'যাত্রা' প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত—এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন যাত্রার কাহিনী নির্বাচন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। রামায়ণ দূর অযোধ্যার কাহিনী। এ কাহিনীর বিশেষ জনপ্রিয় অংশ যাত্রায় অভিনীত হত, আর এই জনপ্রিয় কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র খাঁটি বাঙ্গালীয়ানায় রূপান্তরিত হয়ে মানুষের মনের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিত। সহৃদয় বাঙ্গালী দর্শক তার নিজের সুখ-দুঃখের নানা ইতিহাস এই সব কাহিনী চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পেয়ে অভিভূত না হয়ে পারেনি।

এইভাবেই যাত্রা, পাঁচালি, রামায়ণ পাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ বিশেষ কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়। আবার যে সব কাহিনী ও চরিত্র মাটির কাছাকাছি আছে, কল্পনার ফানুষ যেখানে কম উড়েছে, সেই সব চরিত্রের মধ্যে সাধারণ গ্রাম্য মানুষ তার আপন সত্তা খুঁজে পেয়েছে। যে কাহিনীর মধ্যে মানুষ তার ঘরের কথা বেশী করে শুনেছে, সেই

সেই চরিত্র তার ঘটনাকে বাঙালী কবি গ্রহণ করেছেন হৃদয় দিয়ে, লোককবি রচনা করেছেন নতুন রামরসায়ণ। কবি রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনী সাধারণের সামগ্রী করে তুলেছেন, সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য লোকসাহিত্য। রামকথা-ভারতকথার বিশেষ বিশেষ চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য লোকসঙ্গীত, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি।

রামায়ণের আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড, আর বিশাল মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের ঘটনা, অগণিত মানুষ, আর বিশেষ কয়েকটি পর্বের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি চরিত্র লোকসাহিত্যে স্থান করে নিল। লোককবি যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে সৃষ্টি করলেন রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী দিয়ে গড়া লোকগাথা। জীবনের একটা গভীর সত্যের ব্যঞ্জনা লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত হল।

---

১ বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ১

২ লোকসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৬১। পৃঃ ৯১

৩—৭. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড। ১৯৭৭।

৮-১২. লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩য় খণ্ড। ১৯৬৭।

১৩. বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য। শিবানি বর্ধন। ১৯৭১।

১৪—১৭. চক্‌বিহারী, নদীয়ার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৮—২০. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৫ম খণ্ড। ১৩৭১

২১, ২২ চরবিহারা নদীয়ার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

২৩. হাঁসপুকুর নদীয়ার শ্রীমঙ্গল বিশ্বাসের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লোককবির রচনার সঙ্গে মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত চরিত্র, ঘটনা ও উপস্থাপনার বিভিন্নতা সম্পর্ক আলোচনা

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বাংলার লোককবি যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে এই দুই মহাকাব্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এ সাহিত্য লোকের সাহিত্য। রামায়ণ মহাভারতের বহু ঘটনা এখানে অনুপস্থিত, বহু চরিত্র এ রচনায় স্থান পায়নি। গ্রাম্য পরিবেশে লোককবির কল্পনার সীমা যতদূর বিস্তৃত হতে পারে, তা এ সাহিত্যে সম্ভব হয়ে উঠেছে। এখানে কবি তাঁর নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি ছাপিয়ে মহাকাব্যের বিশাল অঙ্গনে উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁর অন্তরের অনুভূতি, তাঁর কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা, কল্পনার বিশালতা সব মিলিয়ে তিনি লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রামকথা ও ভারতকথা ভিন্ন এক মহাকাব্য সৃষ্টি করেছে। এখানের নায়ক-নায়িকা পল্লীর সাধারণ মানুষ। এ কাব্যে পুষ্পক রথের পরিবর্তে ঘোড়ার গাড়ি চলে। সীতার মা, গ্রাম্য বালিকার মায়ের স্থান অধিকার করে। রামের পিতা গামছা মাথায় দেয়। কোন ছড়ায় রাম-লক্ষ্মণ দুটি ফুল মাত্র। কোথাও বা রাম-সীতা বিয়ের আসরে কড়ি খেলার আসরে কড়ি খেলায় মত্ত। লোককবি আপন মাধুর্যে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন; ঘটনাকে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে সংস্থাপন করতে দ্বিধা করেননি। কৃত্তিবাসও রামায়ণ রচনা কালে তখনকার সমাজকে অস্বীকার করতে পারেননি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কৃত্তিবাস' প্রবন্ধে বলেছেন—"কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত, কিরূপ আলেখ্য তাঁহাদের নয়ন রঞ্জন করিবে। কবিত্বের সার্থকতায় এই মূল মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে।"[১] লোককবিও বোঝেন, তাঁর কাব্য কেমন করে লোকের আসরে জমিয়ে তুলতে হয়। তাইতো মুসলমান সমাজের আলকাপের ছড়ার আসরে কবি ছড়া বলেন—

"শিকার কারণ রাম লক্ষ্মণ গিয়েছিল বনে ॥
মৃগ ধরিবার তরে রাম গেল বন মাঝারে।
সেখানে দেখেছে ঘোড়ার গাড়ী, কত চলেছে সারি সারি।

রাম তখন অবাক হয়ে লক্ষ্মণকে তা জিজ্ঞাসিলে,
লক্ষ্মণ বলে, ওগো দাদা, এখানে তো জনক রাজা
জনকের আছে একটি বেটি তাহার রূপে পরিপাটি ।।"২

—নদীয়া

এ ছড়ায় রাম লক্ষ্মণ মৃগয়ায় গিয়ে ঘোড়ার গাড়ী সারি সারি চলতে দেখেন। এ ছড়াতেই আরো উল্লিখিত হয়েছে,—

"মিথিলাতে গিয়ে রামের হল বিয়ে।
হাতে হাতে ঐ সীতাকে সঁপে দিল রামের হাতে,
রাম বেড়ায় দেশ বিদেশে লক্ষ্মণ থাকে সীতার কাছে।
ও সীতা কেমনে হরিল রাবণ, লঙ্কায় লয়ে গেল ।।"৩

—নদীয়া।

টুসু গানে আছে—

"রাম গেছেন মা মিরগ মারতে
পথে পেলেন জোড়া বেল,
কোথায় ছিলেন দুষ্টু রাবণ—
রামের বুকে মারলো শেল ।।"৪

—বাঁশপাহাড়ী।

বিয়ের গান—

(১) "শ্রীরামচন্দ্রের বাসি বিয়া মিথিলায়।
দেখতে রামের বিয়া স্বর্গপুরের বাসী যারা
গোপনে থেইকে চায়।"৫

—ঢাকা

(২) "তোরা আয়লো সকলে,
আমার সীতানাথকে স্নান করাইবাম
সুশীতল জলে।"৬

—ঢাকা

(৩) "রাম্যে সাজে, হনুমানেরে কি দিয়া
সাজাব বাবাজান আমারে।
ঘরে তো আছে পাঁচ শত টাকার মুকটরে।
তা দিয়ে সাজাবো লক্ষ্মণ তোরে।

রামো সাজে, রামো সাজে, হনুমানরে কি দিয়ে
সাজাব বাবাজান আমারে।
ঘরেতে আছে কলকাতারও শাড়ীরে, তা দিয়া
সাজাব লক্ষ্মণ তোমারে।
রামো সাজে, রামো সাজে, হনুমানেরে কি দিয়া
সাজাব বাবাজান আমারে।
ঘরেতে আছে বাসের তৈল
তা দিয়ে সাজাবো,
লক্ষ্মণ তোমারে।"[৭]
—ফরিদপুর।

মুসলমান সমাজের বিয়ের গানে কলকাতার শাড়ী দিয়ে ভাই লক্ষ্মণকে সাজাবার উল্লেখ আছে। রামায়ণের কালে বাল্মীকি কেন, কোন লোককবি কলকাতার শাড়ীর স্বপ্নও দেখেননি, কিন্তু এখানে মহাকাব্যের সীমা ছাড়িয়ে লোককবি তাঁর কল্পনায় লক্ষ্মণকে কলকাতার শাড়ীতে ভূষিত করতে চেয়েছেন। বিয়ের গানে এমনি অফুরন্ত প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

(৪) "রামচন্দ্র বিয়ার সাজেরে
রামের মাও ভাগ্যবত্তারে,
রামও রামক সাজন করেরে।
কোমরে তুলিয়া দিলোরে
মাও অগ্নিপাটের ধুতিরে
গায়েতে তুলিয়ে দিলোরে মাও উড়ানী চাদররে
মাথায় তুলিয়া দিলোরে মাও মনিরাজ পাগিড়ারে,
পায়ে পউরাইয়া দিলোরে—
মাও বানত্তিয়া জুতারে,
রামের মাও ভাগ্যবতীরে, মাও রামক সাজনরে,
রামচন্দ্র বিয়ার সাজে সাজেরে।"[৮]
—গোয়ালপাড়া, আসাম।

তত্তপূরি বা মুখচন্দ্রিমার সময়ে গ্রামের এয়োরা গান গায়। এ গানে রামের গলায় সোনার মালা দোলে। অযোধ্যার রামচন্দ্র এখানে অনুপস্থিত। এই কাহিনী রামায়ণে কোথাও নেই।

(৫) "ধইরা তোল ধইরা তোল রামের সিংহাসন।
ধইরা তোল সীতারই আসন॥
রামের গলে শোলার মালা।
সীতার হস্তে সোনার বালা॥
দুই মুখে চারি চোখে হইল দরশন।
পুরোহিত আইসা বলে হইল শুভক্ষণ॥
ধুতরার সহস্র প্রদীপ ধরগো তুলিয়া॥"৯

—ঢাকা

স্ত্রী-আচার, পাশা খেলায় একটি বিশেষ দিক। বধূ এ খেলায় সর্বদা জয়লাভ করে। বর পরাজিত হয়।

(৬) "ছি ছি ছি
লাজে মরি,
শ্রীরাম হারিল খেলায়,
জিতল জানকী।"১০

বিয়ের গানের মধ্যে কন্যা বিদায়ের গানগুলি বড়ই করুণ। বিয়ের পর ঘর ভাসিয়ে আদুরে কন্যা পরবাসী হতে এতদিনের সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। উল্লিখিত গানটির সঙ্গে রামকথার কোন সম্পর্ক নেই। সীতা এখানে বাড়ীর আদুরে মেয়ে। বালিকা বধূ আজ স্বামীগৃহে যাত্রী।

(৭) "সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো।
বড় পুকুরের জলই চিংড়ি কে খাইবে গো॥
মাছের তলার ছাতুর হাঁড়ি কে খাইবে গো।
সীতা মোর ঘর যাইবে গো॥"১১

বোলান গানে লব-কুশের কাহিনীর মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। হিন্দি-বাংলার সংমিশ্রণে বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে এ ভাষা ধ্বনিত হয়। মাতা-পুত্রের সম্পর্ক এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলা বিহারের সীমান্তে যে সাঁওতাল দল একদিন ঘর বেঁধেছিল, তারাই আজ নদীয়ার চকবিহারীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের লৌকিক রামায়ণ মূল রামায়ণ থেকে ভিন্ন, চরিত্র সৃষ্টি থেকে শুরু করে গান রচনায় তারা আপন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখে যায়। একটি বোলান গানের অংশবিশেষের উল্লেখে এ আলোচনা স্পষ্টতর হবে।

পবন কো বাণ কো ছুটাতে বাণ।
ছুটাতে বাণ বধিতে বাণ॥
ধীরে ধীরে ছুনো ভায়া
চলে এক সাথে।
জানকীর কাছে গিয়া বলে মাইজী॥১২

—চর্কবিহারী, নদীয়া।

রামকথার-ভারতকথার বহু নিদর্শন দেওয়া সম্ভব, যেখানে মূল বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাস-মহাভারতকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে লোককবি তাঁর আপন কবিত্ব বলে লোকগাথা রচনা করে সরল বাঙালী শ্রোতার মন জয় করেছেন। মূল মহাকাব্যের নায়ক অথবা কোন চরিত্রের নামটি মাত্র সম্বল করে লোককবি আপন প্রতিভা বলে নব রাম-রসায়ণ সৃষ্টি করেছেন। কৃত্তিবাসও নতুন কাহিনী সৃষ্টি করে রামায়ণের মূল কাহিনীর সঙ্গে একত্রে গ্রথিত করেছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কৃত্তিবাস' প্রবন্ধে একথা স্বীকার করেছেন—"রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস, ভবভূতি, রঘুবংশ, উত্তর রামচরিত রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে স্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নতুন মূর্তিও গঠন করিয়াছেন। কবির কল্পনা বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব নির্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্তন দেখিতে পাই। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিকৃত পথ কল্পনার স্রোতে অল্পবিস্তর ছাড়িয়া অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ নিজ কল্পনার দ্বারা অনেক আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া [illegible] গ্রন্থ মনোজ্ঞ করিয়াছেন, সর্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু, তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার চরম কল্পনা শক্তির উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলি সঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাস চঞ্চলা মূর্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কোষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে কত নিভৃত সৌন্দর্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূ-কম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বেচ্ছা বিহারিণী কল্পনা কোনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও বা নূতন পথে—যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা

চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন, বীরবাহু প্রভৃতি সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।"[১৩]

ডঃ সুধীরকুমার করণের 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে ৩০টি ভাদুগান সংকলিত হয়েছে। এই সংকলন গ্রন্থের দুটি ভাদুগান উদ্ধার করা হল, যে গানে পল্লীকবির কল্পনায় রামচন্দ্র, কৌশল্যা, সুমিত্রা এক ভিন্ন খাদে, ভিন্ন পরিবেশে চিহ্নিত হয়েছেন: কবির সৃষ্টিতে 'রাম' বাকল পরেছেন, কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাম-সীতার খোঁজে বনচারী।

(১) "মাথায় জটা, ত্রিশূল কাঁটা পরে রাম গাছের বাকল।
রাম সাজেছেন বনে যাতে বাকল করে ঝলমল॥" (পৃঃ ৩৩৫)

(২) "রামের মা কৌশল্যা রাণী লক্ষ্মণের মা সুমিত্রা।
দুই বহিনে বনে যায়েঁ, ঘুরাই আনবে রামসীতা॥" (পৃঃ ৩৩৫)[১৪]

লোককবির কল্পনাপ্রবাহ—কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, 'সে আপন ভাবে বিভোর হয়ে ছুটে, পরের ভাবে ভোলে না'।

১, ১৩. সমালোচনা সংগ্রহ। সপ্তম সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃঃ ২৭৮, ২৮১।

২—৩. লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড। ১৯৬৬।

৪—৯, ১১. লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩য় খণ্ড। ১৯৬৭।

১০. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। ৩য় সং। ১৯৬২।

১২. চকবিহারী, নদীয়ার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৪. সীমান্ত বাংলার লোকযান। ডঃ সুধীরকুমার করণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বিভাগ

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "লোক-সাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি,—ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে।"[১] সংহত সমাজে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি, যে সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেনি, যে সমাজ বাইরের সংস্কৃতিকে দু-হাত ভরে গ্রহণ করেছে, যে সমাজ নিজের সংস্কৃতিকে বিসর্জন না দিয়ে অপর সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে, সে সমাজে লোকসাহিত্যের জন্ম। 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসে' ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তীর মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :—"লোকসাহিত্য বিষয়টি লোক-সংস্কৃতি নামক বিজ্ঞানখণ্ড একটি শাস্ত্রের অত্যন্ত সুপুষ্ট এক উপাঙ্গ অর্থাৎ যদি বিজ্ঞানের ভাষায় লোক-সংস্কৃতিকে Genus বলি, তবে লোকসাহিত্য হল Species।"[২]

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী বলেন, "বৃহৎ বনানীর ন্যায় সমারোহে ফুল ফলের স্বাভাবিক অবদানে আমরা মুগ্ধ, কিন্তু কে কখন বীজ বপন করিল, চারা রোপণ করিল, আমরা কেহই তাহার খবর রাখি না—কোন কথা জিজ্ঞাসাও করি না। এই বনানী আপনিই জন্মিয়াছে। লোকসাহিত্যেও তেমনি কাহার কোন প্রয়াস নাই, মানব মনে আপনি জন্মিয়া আপনিই তাহায় দোলা জাগাইয়াছে।

বাহিরের লৌকিক ও প্রাকৃতিক জগতে যেমন অবিরাম নানা কাজ চলিতেছে, মানবের অন্তর্জগতেও তেমনি এ দুইএর সমবায়ে একটা সাহিত্যের গঠনকার্য চলিতেছে। এই সাহিত্যের গঠনকার্যকেই গ্রাম্য কবি ঐক্য সূত্রে গাঁথিয়া, রূপ রস দান করিয়া নিত্যকালের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। লোকসাহিত্য সেই নিত্যকালের রচিত কুসুমার্ঘ্য আর অনন্ত কালের সাধিত সুর :

বন-বাদাড়ে যে ফুল ফুটে,
যে পাখী গায় আপন মনে।
তার তুলনা মিলে নাক
বড়লোকের প্রমোদ বনে।"[৩]

আশা-নিরাশায়, বিরহ-মিলনে, ধর্মানুভূতিতে, মানুষের বিরহ-বিচ্ছেদের মর্মদাহে—যে গান লোকের অন্তর থেকে কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে—সেই মর্মবাণীই লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার বৈচিত্র্যময় ঋতু-প্রকৃতির মতই বাংলার লোকসাহিত্য বিভিন্নতায় ভরা। 'বাংলার মেঠো সুরে বাঙালিরা গেয়েছে জীবনের গান, রচনা করেছে রূপাবের কাব্য—আর বাজিয়েছে প্রেমের বাঁশী।' মানুষ তার সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তা আর জীবনধারা নিয়ে ছুটে চলেছে নদীর স্রোতের মত। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন জাতি একটা সংহত সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপন সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। ক্রমে ক্রমে লোকসাহিত্য স্থান লাভ করেছে উন্নত চিন্তা ও সুষ্ঠু ভাব বিকাশের মৌলিক উপাদান উপকরণ রূপে। ডঃ নীটজের মতে, "বেদের কোন কোন অংশ ছিল রূপক রূপকথা।".৪

আমরা লোকসাহিত্যের কল্যাণে নিছক সাহিত্য ছাড়া পাই 'নৃতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও ইতিহাসের নানা উপাদান,' লোকসাহিত্যের আলোচনায় প্রতিফলিত হয় ব্যষ্টি ও সমষ্টি মনের ক্রমবিকাশের ধারা, সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতি। নবাব সুলতান রাজরাজড়ার পৃষ্টপুটপিষ্ট সাহিত্য যখন ভাষা-শিল্প-সাহিত্য অনুশীলনে উচ্চকোটিতে বিদ্যমান ও সমৃদ্ধ—তখন সভ্যতার স্পর্শমুক্ত গ্রাম বাংলায় কি অনবদ্য সাহিত্য পল্লীকবি সৃষ্টি করেছেন, তা চিন্তা করলেও বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। যারা বাল্মীকি রামায়ণ চোখে দেখলেন না, তাঁরা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রামকথার অপূর্ব সংযোজন সাধন করলেন। আবার যাঁরা বেদব্যাসের মহাভারতের খবর রাখেন না, তাঁরা সৃষ্টি করলেন ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধায় ভারত-কথার বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার লৌকিক কাহিনী। লোকসাহিত্যের এই সকল কথা-কাহিনীর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারতের নব-রূপায়ণ সার্থকতা মণ্ডিত হল। বাংলার লোকসাহিত্য বৈচিত্র্যময়. বৈচিত্র্যময় এ সাহিত্যের নানা বিভাগ। একমাত্র সঙ্গীতেই যে কত ভাগ আছে, তা সম্পূর্ণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নানা পালাপার্বণে গীত, মেয়েলী গান, বিয়ের গান আর ব্রতের গান। উৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নৃত্য, আর তাদের সঙ্গীত অপূর্ব মাদকতায় ভরা—ঝাড়ু, জারি, সারি—প্রভৃতি গান আছে এ বিভাগে। বেদের গান, পটুয়ার গান, গীতিকা। গীতিকা বাংলা লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কথার মধ্যে আছে ব্রতকথা, রূপকথা, নীতিকথা প্রভৃতি। ধাঁধা—ব্যক্তি মানসের সৃষ্টি, এরও বিভাগ আছে—সাহিত্যিক ধাঁধা, লৌকিক ধাঁধা, এবং প্রবাদ, পুরাকাহিনী, ইতিকথা প্রভৃতি। বাউল গানকে কোন কোন লোকসাহিত্য-শাস্ত্র লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করতে চান না, কারণ বাউল একটি বিশিষ্ট সাধন সঙ্গীত—একটি আধ্যাত্মিক ধারার সঙ্গে সংযুক্ত। একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে

দেখা যায় যে, বাউলের তত্ত্ব ও গানের সুর বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের জীবন সাধনকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছিল, এবং পরে তা একটি দার্শনিক প্রত্যয় ও সাধন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, কাজেই ব্যাপক অর্থে বাউলকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করায় কোন দোষ নেই।

বাংলা লোকসাহিত্যের আরও নানা বিভাগ আছে। বিভাগ আছে ছড়ায়, আরও কত আছে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আমাদের অজানা। যেটুকু জানা আছে, সেইটুকুই মহাভারতের মত বিরাট। মহাভারতে যেমন অজস্র চরিত্র, কাহিনী উপকাহিনী স্থান পেয়েছে, লোক সাহিত্যেও তেমনি বিচিত্র বর্ণময় নানা কথার কলধ্বনি লোককবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

লোকসাহিত্যের ঠিকুজি করা কঠিন। কারণ তার জন্মকালের এবং জনক-জননীর যথার্থ নিরূপণ করা কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে একান্ত অসম্ভব। বস্তুত লোক-সাহিত্য অনেকটা যেন বৈদিক সংহিতার মতই অপৌরুষেয়ের দাবী বহন করে চলেছে।

আসলে জাগতিক দৃষ্ট বস্তুর মূলে কাল ও কর্তা থাকেই। বহুর সাহচর্যে সমূহ্নয় পাঠ ও আবৃত্তিতে সমবেত সঙ্গীতে কর্তার বিশেষ ব্যক্তিত্ব একটা নৈর্ব্যক্তিক ঐকতানের মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তার ফলে তার স্রষ্টা ব্যক্তিক, কবি-শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যায় না; আর তার সঙ্গে সৃষ্টিক্ষণটি, জন্মমুহূর্তটি হারিয়ে যায়। লোকজীবন বহতা নদীর মত অবিশ্রান্ত অফুরন্ত নিত্য ধারা। এই অবিরাম ধারার কলধ্বনি লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত। এইভাবে বিচার করলে লোক-সাহিত্য ধারা নিত্য-স্রোতা গঙ্গা ধারার মত চিরন্তন, পুরাতনের পাশ দিয়ে প্রতিনিয়ত নূতনের সৃষ্টি তার স্বভাব ধর্ম।

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। পৃঃ ১

২. বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী। পৃঃ ১

৩. লোকসাহিত্যে ছড়া। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী। পৃঃ ২

৪. Vide—A History of Indian Literature, Vol. V. by M. Winter Nitz.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছড়া

ছড়া বাংলা লোকসাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গ। লোকসঙ্গীতের মত ছড়াও লোকসাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম রূপটি ধরা পড়ে ছড়ার মধ্যে। ছড়া রচয়িতা সমাজের সচেতন ব্যক্তি মানস নয়। 'স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি এই অসঙ্গত, অর্থহীন, যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি' ছড়ার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে। ছড়া একটা প্রথাবদ্ধ আদিমতা ব্যাপক-সারল্য, যা বুদ্ধিচর্চায় নিষ্প্রভ নয়, ব্যক্তি চেতনার শাণিত মননে পরিমার্জিতও নয়। যৌথ সংহতি আর দৃঢ় সামাজিকতা ও পারিবারিকতাই ছড়ার প্রাণ সম্পদ। লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্যময় ছড়া বিশেষতঃ শিশু বিষয়ক ছড়াগুলি প্রথম স্থানীয়। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মত মানব সভ্যতার কোন স্তরে যে ছড়াগুলি রচিত হয়েছিল, তার সঠিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। তবে একথা সত্য যে, ডাক ও খনার বচন আর শিশু বিষয়ক ছড়াগুলি বেশ প্রাচীন। ছড়া স্বপ্নদর্শী অচেতন মনের সরল স্বাভাবিক প্রকাশ, সে কারণ আনন্দ সৃষ্টি ও সমগ্র মানব গোষ্ঠীর লোকসাহিত্যের বুনিয়াদ, শিশু সাহিত্যের রোমান্স।

রবীন্দ্রনাথ অকৃত্রিম আন্তরিকতার তাগিদে ছড়া সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে ভুলান ছড়ার আলোচনায় কবি বিস্তৃত ছড়া সাহিত্যের বিষয়টি অপূর্ব রসোজ্জ্বল করে তুলেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, ছড়ার সমগ্র পরিচয় কত গভীর। শিশু বিষয়ক ছড়া মাত্রেই ছেলে ভুলানো ছড়া নয়। ছড়ারও বিভিন্ন বিভাগ আছে। (১) ছেলে খেলার ছড়া—আবার ছেলে খেলার ছড়াকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগ। অভ্যন্তরীণ ছড়ার দুটি বিভাগ,—একটি বিভাগ ছেলেদের, অপরটি মেয়েদের। (২) ছেলে ভুলানো ছড়া। (ঘুম-পাড়ানি ছড়া) (৩) ঐন্দ্রজালিক ছড়া। (৪) মেয়েলী ছড়া (ব্রতকথা) (৫) নৈসর্গিক ছড়া (ডাক ও খনার বচন)।

লোকসাহিত্যবিদ্ মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী বলেন,—"প্রাচীন শিশু ছড়াগুলির উৎপত্তির কারণ ও সময় জানা না গেলেও আমরা একটা সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহার সম্বন্ধে একটা ধারণার ক্ষীণ রেখা পাইয়া থাকি। আদিম কালে নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ দেহের উপর যতটা ক্রিয়াশীল ছিল, মনের উপর বা হৃদয়ের উপর ততটা ছিল না। কালক্রমে নরনারীর নিঃসঙ্গতার শোচনীয়তা, বাস্তব জীবনের বিকাশ ও প্রসার, পারিপার্শ্বিকতার তাগিদ, স্বপ্নদর্শী মনের

ক্রমিক সচেতন অবস্থা, হৃদয়বৃত্তির সক্রিয় উন্মেষ ও প্রসার প্রভৃতি কারণে মানুষ ক্রমে আত্মদর্শী ও ভবদর্শী হইয়া বর্তমানের সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ রচনায় অনুপ্রাণিত ও চেষ্টাশীল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে আসিল সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তা আর সমাজ শিশুর প্রতি মায়া মমতার সংকল্পে সংহত সমাজ পরিণয় প্রথা। এই স্বাভাবিক মায়া মমতার সোনার কাঠির স্পর্শেই জন্ম নিল ঘুম পাড়ানির গান ও অপরাপর ছেলে ভুলানো ছড়া।"[১]

'নিত্যনব' ছড়াগুলির চিরত্ব ও নূতনত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন। ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছু নাই। দেশ-কাল-শিক্ষা-প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্ব প্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন, কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজ কৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু সাহিত্য, তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়াছে।"[২]

যতদিন পর্যন্ত শিশুর মুখে ভাষা ফোটে না, ততদিন পর্যন্ত মা, দিদিমা বা ঠাকুরমা ছড়া বলে শিশুকে ভুলিয়ে রাখেন। এই ছড়াগুলি শিশু বিষয়ক ছড়ার একটা অংশ মাত্র, এই ছড়ার আবৃত্তিকারিণী শিশু নয়। কিন্তু যখনই শৈশব পার হয়ে শিশু বাল্যে প্রবেশ করে, তখন সে কেবল মা, দিদিমার আবৃত্তি শুনে তৃপ্ত হতে চায় না, সে নিজেও ছড়া আবৃত্তি করতে শেখে। তখন তার খেলার জীবন। নতুন জগৎ। সে খেলাকে কেন্দ্র করে ছড়া আবৃত্তি করতে শেখে। প্রথম ছড়াগুলি যদি ছেলে ভুলানো ছড়া হয়, তবে দ্বিতীয় ছড়াকে ছেলে খেলার ছড়া বলা যেতে পারে। ছেলে ভুলানো ছড়া আর ছেলে খেলার ছড়া অভিন্ন নয়। প্রথম ক্ষেত্রে অপরের আবৃত্তি ছড়া শুনে শিশু তৃপ্ত হয়, পরবর্তী সময়ে সে নিজেই ছড়া আবৃত্তি করে।

ছেলে ভুলানো ছড়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি ছড়া-গুলিকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে

রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়া ও কলা বিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘ বিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতের এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা বৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থ বন্ধন শূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু মনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।"[৩] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—"রসের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ছেলে ভুলানো ছড়ার ইহা অপেক্ষা সার্থক বিশ্লেষণ আর কিছুই হইতে পারে না।"[৪]

রামায়ণ ও মহাভারত বাংলার জাতীয় মহাকাব্য। এই কাব্য দুটি বাঙালীর মানসিকতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রভাবিত করেছে তার সাহিত্যকে, তার সংস্কৃতিকে, আর দৈনন্দিন আচারকে। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রাম-কথা, ভারতকথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, ছড়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

ছড়ার ক্ষেত্রে রামকথার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা ঘুম পাড়ানি ছড়ার মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে। মা ছড়া আবৃত্তি করেন, নির্বাক শ্রোতা শিশু মায়ের আবৃত্তি করা ছড়ার ছন্দে স্বপ্নের জাল বোনে। উল্লেখ করা যেতে পারে—'সাত রাজার ধন এক মানিক'—সন্তান, মায়ের ভবিষ্যতের সব আশা। শিশুকে ঘুম না পাড়াতে পারলে মায়ের আর পাঁচ কাজ হবে না। একটা ঐন্দ্রজালিক ভাব-মণ্ডল রচিত হয়—মায়ের বলা ছড়ায়। মা শিশুকে কেন্দ্র করে ছড়া রচনা করেন, শিশু ধীরে ধীরে ঘুমের মধ্যে অচীন দেশে পাড়ি জমায়। বর্গীর উৎপাত এই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একদিন যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, হয়ত সেই দিন কোন মা বর্গীর ভয় দেখিয়ে তাঁর সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন, আজও সেই ছড়া মায়ের মুখে আবৃত্ত হয়, কিন্তু রামায়ণের বীর চরিত্র এই ছড়াটির কাব্যমূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মাসের বৃন্দাবন, ঘরের লক্ষ্মী-নারায়ণ আর রামায়ণের বীর রাবণ রাজা সব একাকার হয়ে শিশুকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তোলে, মা ছড়া বলেন—

(১) "আয় ঘুম, আয় ঘুম বর্গী এলো দেশে।
চড়াই পাখী ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।

মরা গাছে ফুল ফুটেছে লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥
সাত স্বর্গের সিঁড়ি দিতে রাবণ রাজা মরে।
খোকার মুখে স্বর্গ নামে যখন ঘুমের ঘোরে ॥"[৫]

—২৪ পরগনা।

(২) "আয়া, আয়া, আয়া,
তত্ত দুধের কায়া।
রাম-সিতের বিয়ে
সিঁথে সিন্দুর দিয়ে ॥"[৬]

— যশোর।

দ্বিতীয় ছড়াটিতে রাম-সীতার বিয়ের কথা স্থান লাভ করেছে।

হা-ডু-ডু খেলার ছড়া ছেলেদের বাইরের খেলার ছড়া। ছেলে যখন বড় হয়ে উঠে, বহির্মুখীন মন তখন বহির্বিশ্বে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চায়। শিশু এখন কিশোর, সে খেলার ছড়া আবৃত্তি করে—। এই হা-ডু-ডু খেলার ছড়ায় রামনামের সঙ্গে শ্যামনাম স্থান করে নিয়েছে —

"চাপিলা চুপিলা ঘন ঘন মচ্ছিলা।
রামের রুকা শ্যামের বাঁশী ॥"[৭]

—মৈমনসিংহ।

মেয়েরা যখন একটু বড় হয়ে উঠে, ইকড়ি-মিকড়ি খেলার স্তর পার হয়ে যায়, তখন সে তার সঙ্গী-সাথী নিয়ে ছড়া আবৃত্তি করতে শেখে। খেলা করে তার আপন ছোট গণ্ডীতে। রাম-সীতার বিয়ের স্বপ্ন সে ছড়ায় আছে। বালিকার স্বপ্ন তাতে জড়ানো।

"হেনা হেনা হেনা।
তত্ত দুধের ফেনা ॥
চিনি চাটা চাটা।
বেগুন কোটা কোটা ॥
হর-পার্বতী।
লক্ষ্মী সরস্বতী।
রাম-সীতার বিয়ে,
সিঁথের সিন্দুর দিয়ে।
ও-অলকা,
বুক ঝলকা ॥"[৮]

—হুগলী।

বর্তমান বাংলা দেশে ছড়াটি অল্প একটু পরিবর্তিত হলেও এর রূপ-রস অভিন্ন হয়ে আছে।

"আনা আনা আনা,
তব দুধের ফেনা ॥
সিম গোটা গোটা,
বেগুন চটা চটা।
ডান কানে সোনা,
বা কানে রূপো।
রাম-সীতার বিয়ে
নাকে নোলক দিয়ে,
অলকা বুক ঝলকা।"[৯] —ঢাকা।

অধিবাস

পারিবারিক জীবনে বিবাহ একটি প্রধানতম উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিয়ের গানের মতই 'বিয়ের ছড়া' বিশেষ সুষমায় মণ্ডিত। এ উৎসব সর্বাধিক আনন্দ মণ্ডিত, আবার কন্যার পিতার কাছে করুণও বটে। বিয়েকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলার মেয়েমহলে কত ছড়াই না প্রচলিত আছে। আর আছে কত না বিভাগ। প্রথম বিভাগটির নামকরণ করা হয়—অধিবাস। রবীন্দ্রনাথ এই বিভাগের যে ছড়াটি সংগ্রহ করেছিলেন, তার আরও কতকগুলি পাঠ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করেন এর প্রাচীনতম পাঠটি বর্দ্ধমান জেলা থেকে আবিষ্কৃত। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত ছড়াটির উল্লেখ করা হল।

রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ছড়ার কামচারিতা ও কামরূপধারিতা।

আলোচ্য ছড়াগুলিতে 'সীতা-রামের' কথা উল্লিখিত হয়েছে, যার চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে রামায়ণের কোন মিল নেই।

(১) "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শশুর বাড়ী কাজিতলা দিয়ে ॥
কাজি ফুল কুড়াতে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুমু ঝুমু পা ঝুমু ঝুমু সীতা-রামের খেলা ॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।

আলো চাল দেব টাপাল ভরিয়ে ॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাট্
হেথায় তো জল নেই ত্রিপুর্ণির ঘাট ॥
ত্রিপুর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে ॥
ওড়ফুল কুড়তে হয়ে গেল বেলা
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্কুর বেলা" ॥১০

—রবীন্দ্র সংগ্রহ।

বিয়ের আগের দিন দিবাভাগে অধিবাস উপলক্ষে ছড়াটি আবৃত্ত হয়। এই বিভাগের অন্য ছড়াগুলি এবার উল্লিখিত হল। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া এবং চব্বিশ-পরগনায় সংগৃহীত ছড়াগুলি রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছড়াটির ভিন্ন পাঠ। কিন্তু রস ও তথ্যের দিক দিয়ে প্রায় অনুরূপ।

(২) "ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো চল পিটুলি খেয়ে।
আজ ঘুঘুর অধিবাস, কাল ঘুঘুর বিয়ে।
ঘুঘুকে নিয়ে গেলুম বকুলতলা দিয়ে ॥
বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলুম মালা।
রামলক্ষ্মণের বাদ্যি বাজে সীতানাথের খেলা ॥
সীতানাথ নাচেরে কাঁকাল দোলাইয়ে।
আলোচাল ভেজে দেব টোপর ভরিয়ে ॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাট।
কতক্ষণে যাবোরে ত্রিবেণীর ঘাট ॥
ত্রিবেণীর ঘাটেরে ঝুর ঝুর বালি।
সোনা মুখে রোদ লেগেছে—তুলে ধর ডালি ॥
ত্রিবেণীর ঘাটেতে হাতী নেমেছে।
হাতীর গলায় জোর ঘন্টা বাজতে লেগেছে" ॥১১ —বর্দ্ধমান।

(৩) "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে—
যমুনাকে আনতে যাব বকুলতলা দিয়ে।
বকুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে একটি পেলাম মালা,
কার গলায় দিব মা সীতা-রামের গলায়।

সীতারাম বলে আমি চাল কলাই খাব,
চাল কলাই খেতে খেতে হেথা হোথা যাব।
হেথা হোথা জল নাইক ভিকুনির ঘাটে,
বালি চক্ চক্ করে,
শৈল মুখে রোদ লেগেছে
রক্ত পড়ে ফেটে" ॥১২ —২৪ পরগনা।

(৪) "আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শশুরবাড়ী বকুল তলা দিয়ে;
বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেলে গেলুম মালা,
রাম রাবণের বাদ্যি বাজে সীতা রামের খেলা।
নীচরে ভাই সীতারাম কাঁকল বেঁকিয়ে,
আলোচাল খেতে খেতে পেট হল কাঠ
হেথা হোথা জল পাবি পিঁপড়ির মাঠ" ॥১৩ —বাঁকুড়া।

কন্যা বিদায়

কন্যা বিদায়ের গানের ন্যায় কন্যা, বিদায়ের ছড়াগুলি চোখের জলে ভরে থাকে। সীতার বেদনাময় করুণ কাহিনীর মত বিয়ের পরে কন্যা বিদায় নেয় তার পিতার কাছ থেকে। কন্যা চলে শশুরবাড়ী। অচেনা অদেখা সংসার। পিতা-মাতার চোখের জলে বিদায় ক্ষণটি ভরে ওঠে, চরম বেদনাময় মুহূর্ত। পাড়া-পড়শীও এ রোদনে যোগদান করে। প্রকৃতি দুহিতা সীতা যেমন তাঁর প্রিয় সংসারকে চোখের জলে ভাসিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখানে কন্যাও তেমনি তার অদেখা শশুরবাড়ীতে যেন সীতার মতই সবকিছু বিসর্জন দিয়ে বিদায় নেয়। রোদন ভরা এ-ক্ষণে সকলেই কাঁদে।

"আম গাছে ডাকে কোকিল চন্দন গাছে বাসা,
জানকীরে নিবা কৈরা মনে করছ আশা।
আগে যদি জানতাম রে—জানকী তরে নিব পরে,
শঙ্খ সিন্দুর দিয়ারে জানকী বরিতাম তরে।
আড়শি কান্দে পড়শি কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া,
জানকীর বাপ কান্দে গামছা কান্দে লইয়া।
আড়শি কান্দে, পড়শি কান্দে রইয়া রইয়া।
জানকীর ভাইনে কান্দে লেবু পাত্তা লইয়া।

আড়শি কান্দে পড়শি কান্দে কান্দে রইয়া রইয়া
জানকীর ভাই বৌ কান্দে চোখেতে মরিচ দিয়া,
আড়শি কান্দে, পড়শি কান্দে রইয়া রইয়া
জানকীর ভাইয়ে কান্দে চুলের ফিতা লইয়া ॥" ১৪—ঢাকা।

উপরের ছড়াটির জানকী গ্রাম্য বালিকা বধু। রামকথার জানকী সে নয়। লোককবির রচনায় জানকীর পিতা গামছা কাঁধে দিয়ে কন্যা বিদায় ক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মহাকাব্যের নায়িকা এখানে অনুপস্থিত।

ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য

ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য অনেক, উপাদানও বহু। পশু-পক্ষীকে নিয়ে লোক-সাহিত্যে কত ছড়াই না রচিত হয়েছে। বর্তমান ছড়াটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ছড়ায় আমরা সীতা হরণের কাহিনীর নায়ক রাবণের পরিবর্তে ডোমাকে দেখতে পাই। রাম-কাহিনীর কোথাও রাবণ ভিন্ন অন্য কোন বীর নায়ককে আমরা সীতা হরণের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি না, কিন্তু চটগ্রামের এই ছড়াটি বৈচিত্র্যময়।

"রাজার বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত চড়ি যায়।
পথত পাইয়ে লাল কৈয়রা
সীতারে হরি নিয়ে রাজা ডোম যায়" ॥১৫—চট্টগ্রাম

মাছ ধরতে যাব

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত এই ছড়াটির মধ্যে শিশুর আনন্দ যেমন সহস্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি রামধনু তার সীতানাথ এ ছড়ায় অংশগ্রহণ করে ছড়াটিকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। শিশুর স্বপ্নময় কল্পনা কোনও বাধা মানে না। শিশু বাস্তব পৃথিবীর পরিমণ্ডলে অবস্থান করে স্বপ্নরাজ্যে চলে যায়,—এ ছড়ায় রামকথার প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরোক্ষ ভাবে রামকথার কিছু আভাষ মেলে।

"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দু-পারে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে॥
ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেমেছে।
ঝুম্ ঝুম্ চুল গাছটি ঝাড়তে লেগেছে॥
কে রেখেছে—কে রেখেছে দাদা রেখেছে।

আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে।
দাদা যাবে কোন খানদে—বকুলতলা দে।
বকুল ফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রাম-ধনুকে বাদ্দি বাজে সীতানাথের খেলা॥
সীতানাথ বলেরে ভাই চাল কড়াই খাব।
চাল কড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা, জল পাব চিতপুরের মাঠ॥
চিতপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে,
সোনামুখে রোদ লেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥"১৬ —রবীন্দ্রসংগ্রহ॥

বর্তমানের ছড়াটি আরও বৈচিত্র্যময়। রাম-লক্ষ্মণ দুটি ফুল,—এ ছড়ায় স্থান পেয়েছে।

"চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে।
রাম লক্ষ্মণ দুটি ফুল লাগে।
ওপার থেকে জিজ্ঞাসেন মালী—
'কি কি ফুলে মুখ পাখালি?'
সেই ফুল খান কি?
নল ভেঙ্গে ডাল খান।"১৭ —ঢাকা

হরগৌরী সম্বন্ধীয় ছড়া

রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত হরগৌরী সম্বন্ধীয় এই ছড়ায় শঙ্খের নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ। 'রামকথা' হরগৌরী সম্বন্ধীয় ছড়ার মধ্যেও স্থান ক'রে নিয়েছে।

হরগৌরী সম্বন্ধীয় ছড়ায় সাধারণতঃ দেবদেবীর গোপন ঘরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। উমার 'শঙ্খ' পরতে সাধ হয়, দেবী উমা স্বামীকে বলেন, "দিবা সোনার অলঙ্কার না পরিলাম গায়। শঙ্খ পরতে সাধ যায়॥"

ভোলানাথ উমার সঙ্গে একটু কৌতুক করতে চাইলেন। "ভেবে ভোলা হেসে কন শুন হে পার্বতী, আমি তো কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি শঙ্খ পাইব কথি।"

মহেশ্বরের শুভ্র দারিদ্র্যের কথা শুনে গৌরী গর্জে উঠেন, "গৌরী গর্জিয়ে কন, ঠাকুর শিবাই—আমি গৌরী তোমার হাতে শঙ্খ পরতে চাই।"১৮

এরপর স্ত্রীর রাগ যত দূর হতে পারে, অর্থাৎ বাপের বাড়ী পর্যন্ত—

"কোলে করি কার্ত্তিক হাটায়ে লম্বোদরে।
ক্রোধ করি হরের গৌরী গেলা বাপের ঘরে।।"

এদিকে শিব তাঁর সংকল্পিত দাম্পত্য প্রহসনের নেপথ্যবিধান শুরু করলেন; —"বিশ্বকর্মা এনে করান শঙ্খের গঠন।"

শঙ্খ হাতে শিব শাঁখারির বেশে বেরিয়ে পড়লেন গৌরীর সন্ধানে।

"দুই বাহু শঙ্খ নিলেন নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কপটভাবে হিমালয়ে তল্লাসে ফেরেন।।
হাতে শূলী কাঁধে থলি শম্ভু ফেরে গলি গলি।
শঙ্খ নিবি শঙ্খ নিবি এই কথাটি বলে।।
সখী সঙ্গে বসে গৌরী আছে কুতূহলে।
শঙ্খ দেখি এই কথাটি বলে।।
গৌরীকে দেখায়ে শাঁখারি শঙ্খ বার করে।
শঙ্খের উপরে যেন চন্দ্র উদয় হল।।
মণি-মুক্তা-প্রবাল গাঁথা মাণিক্যের ঝুরি।
নব ঝলকে ঝলকে যেন ইন্দ্রের বিজুলি।।"[১৮]

—রবীন্দ্রসংগ্রহ।

হরগৌরী সম্বন্ধীয় ছড়া বাংলা লোকসাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গ। রাম-সীতাকে কেন্দ্র করে যেমন বাংলা লোকসাহিত্যে নতুন রামরসায়ণ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি হরগৌরীকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীর ঘরের কথা, তার আচার সংস্কৃতি লোক-গাথায় প্রচার লাভ করেছে বিভিন্ন রূপে, রসে, কথায়, গানে।

রামকথা লোককবিকে এমনই ভাবে প্রভাবিত করেছে যে রবীন্দ্রসংগৃহীত হরগৌরী সম্বন্ধীয় ছড়ায় তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। হরগৌরীকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীর ঘরের কথা কবি বলেছেন, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে বাদ দিতে পারেননি। বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্যের দুই পুরুষ চরিত্র রাম-লক্ষ্মণ বাংলার লোককবির অন্তরে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, হরগৌরী সম্বন্ধীয় ছড়ায় এই প্রভাব শঙ্খের নামকরণে প্রতিফলিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাম-সীতার দাম্পত্য আমাদের দেশে প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ, তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণ কথায় এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র,

পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়-বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্ব প্রকার হৃদয়-বৃত্তিকে মহৎ ধর্ম নিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোন দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"[১৯]

কবি দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা স্বরূপে কবি বলেছেন, "রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃত পিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।"[২০]

বচন, প্রবচন, নীতিকথা ও সংস্কারমূলক ছড়া

বর্তমান ছড়াটি বাংলা দেশের খুলনা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ ছড়াটির মধ্যে আছে নীতিকথা। মহাভারতের দ্রৌপদী এ ছড়ায় ছড়া-আবৃত্তিকারকের দ্বারা আহুত হয়েছেন।

"কোথায় চন্দন, কোথায় ব্রাহ্মণ,
কোথায় দ্রৌপদী রায়,
অমানুষের সাথে প্রেম করলি
তার জল সমদ্দ খায়।।"[২১] —খুলনা।

আলকাপের ছড়া

প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ জেলায়, বীরভূম ও মালদহের কোন কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে, এই সঙ্গীতকে 'আলকাপ' গান বলে। আলকাপ গানের দুটি বিভাগ—(১) গান, (২) ছড়া। আলকাপ গান পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। আলকাপের ছড়া

অংশের গায়করা আসরে উঠে ছড়া বা গান আরম্ভ করার পূর্বে 'বন্দনা' করেন ; তারপর ছড়া কাটেন।

বর্তমান আলকাপের ছড়ায় রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কথা স্থান পেয়েছে। লোককবি নিজের কবিপ্রতিভাবলে এই লৌকিক ছড়া রচনা করেছেন—

"আমি দশের চরণ করে স্মরণ হইলাম উদয়।
দশচক্রে হয়গো অদ্ভুত—ভগবান হয়েছিলেন ভূত,
দশজনে যা মনে করে করতে পারে তাই।।
রাবণ হরে রামের সীতে দশে বলে ফিরিয়ে দিতে,
না শুনে সে কোন মতে শেষে দশ মুণ্ড ক্ষয়।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত কবি, আসরে ছড়া প্রকাশ করি,
আছেন যত বিচারি স্পষ্ট বিচার চাই।।
আমি কংসারি রূপ ধরি-ধারণ তোমারে করি জিজ্ঞাসন
তোমার কিংকরী নাম কিসের কারণ, বলহে সভায়।
তুমি এই কথাটি বল দেখি
শুনে সকলি বল নাহে তায়।।
আছেন যত মুসলিমগণে, আমি সেলাম জানাই জনে জনে
একবার চাঁদ বদনে আল্লা বলা চায়।
যত আছেন পৈতাধারী চরণে নমস্কার করি
একবার উচ্চস্বরে হরি হরি বলুন গো হেথায়।
যত আছেন মা জননী, বলছি আমি বিনয় বাণী
উচ্চস্বরে উলুর ধ্বনি বলেন এ সভায়।" ২২

—মুর্শিদাবাদ।

বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ন্যায় ছড়ার বিভাগটিও বিশেষ সমৃদ্ধতর। এই বিভাগের কিছু কিছু নিদর্শন উপরে উল্লিখিত হল। উদ্ধৃত ছড়াগুলিতে নানা ভাবে রামকথা স্থান পেয়েছে। ছড়ার বিষয় বৈচিত্র্য বাংলা লোকসাহিত্যকে নানা ভাবে সমৃদ্ধতর করে বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিকে এক ভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

---

১. লোকসাহিত্যে ছড়া। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী।
বাংলা একাডেমীর পক্ষে। ১ম প্রকাশ ১৩৬৯। ঢাকা—১।

২, ৩. রবীন্দ্র রচনাবলী । ত্রয়োদশ খণ্ড । পঃ বঃ সরকার প্রকাশিত । ১৩৬৮ । পৃঃ ৬৬৩ । ৬৮১ ।

৪. বাংলার লোকসাহিত্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । ১ম খণ্ড । ৩য় সং । ১৯৬২ । পৃঃ ১০২ ।

৫, ৭. বাংলা লোকসাহিত্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । ২য় খণ্ড । ১ম । ১৯৬১ । পৃঃ ৮ ।

৬. যশোর খুলনার ছড়া । শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী । ১ম প্রকাশ । ১৯৬৫ । বাংলা একাডেমী । ঢাকা—২ ।

৮, ৯. বাংলা লোকসাহিত্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । ২য় খণ্ড । ১ম সং । ১৯৬১ ।

১০. লোকসাহিত্য—রবীন্দ্র রচনাবলী । পঃ বঃ সরকার । ত্রয়োদশ খণ্ড । ১৩৬৮ । পৃঃ ৬৬৮ ।

১১—১৫, ১৭. বাংলা লোকসাহিত্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । ১ম সং । ১৯৬১ ।

১৬. লোকসাহিত্য রচনাবলী । পঃ বঃ সরকার । ১৩৬৮ । ৬৭২ ।

১৮—২০. রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য । রবীন্দ্র রচনাবলী । ত্রয়োদশ খণ্ড । পঃ বঃ সরকার । ১৩৬৮ । পৃ ৬৬২ (৭) । ৬৬২ । ৭১৩ ।

২১. যশোর খুলনার ছড়া । শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ১ম প্রকাশ ১৯৬৫ । বাংলা একাডেমী ঢাকা—২ ।

২২. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লোকসঙ্গীত

গানের দেশ, বাংলা দেশ। এর শ্যামল প্রকৃতির আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে বাংলার লোক-গাথা, তার সুরসুষমা। বার মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই আছে, গ্রাম বাংলার পল্লীজীবনে। উৎসবকে উপলক্ষ করে কত গানই না গীত হয় গ্রাম-জীবনে। আনন্দ প্রকাশের যে দুটি মাধ্যম,—নৃত্য ও গীত, বাংলার পূজা-পার্বণ-উৎসব উপলক্ষে তা অনুষ্ঠিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে কারণে অকারণে এই গান গাওয়া হয়। টুসু, ভাদু, আবার এককভাবে গীত হয় বাউল গান, আর নানা দেহতত্ত্বের গান। সঙ্গীত যেন গ্রাম-বাংলার জীবন।

একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে যে গান রচিত হয়, লোক-সমাজে মৌখিক ভাবে প্রচারিত হয়, তাকেই লোকসঙ্গীত বলা হয়। অন্য দেশের মত এই বাংলা দেশেও লোকসাহিত্যের মধ্যে লোকসঙ্গীতই সবচেয়ে জনপ্রিয়। কেবল মাত্র রসের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও লোকসঙ্গীত অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে। আধুনিক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পল্লী-বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিতে বসেছে, আর সেই সঙ্গে বিস্মৃতির পথে চলেছে আমাদের আপন সংস্কৃতির ধারা লোকগীতি। তবুও আজও বাংলার মানুষ সন্ধ্যার অবসরে চণ্ডীমণ্ডপে একত্রে মিলিত হয়ে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে অবসর বিনোদনের চেষ্টায় রত থাকে। গীত হয় লোকসঙ্গীত।

আজও কার্তিক মাসের অমাবস্যায় কালীপূজার রাতে মাদল-ধামসা নিয়ে পুরুষরা গোয়ালঘরে সারারাত প্রদীপ জালিয়ে দেবী ভগবতীর অর্চনায় 'জাগান গান' গায়। আজও ঘর ছাড়া বাউল মনের সুখে গান গেয়ে গেয়ে পল্লী-বাংলার পথ পরিক্রমা করে, আজও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে গাঁয়ের মানুষ 'কাঙ্গোড়া' গান করে। পুরুলিয়ায় আজও জ্যোৎস্নারাতে গণেশ বন্দনার পরে আদিবাসী মানুষগুলো মুখোস পরে 'ছৌ-নাচের' আসর জমায়। আজও চালের-গুঁড়ি, চিঁড়ে, চন্দন, হলুদ আর কাঁকুড়ের পাতা দিয়ে মোড়ালের পোঁতা করম গাছের ডালের কাছে ভাদ্রমাসে ইন্দ্র পূজার আগের দিন 'পাতানাচের' আয়োজন করে গ্রাম বাংলার সরল মাটির মানুষ।

লোকসাহিত্য যেমন বৈচিত্র্যময়, তার সঙ্গীত বিভাগটিও তেমনি নানা বৈশিষ্ট্যে ভরা। লোকসঙ্গীত লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত। তবুও দেখা যায়

বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির গান বিশেষ এক একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। মেয়েলী গান গায় মেয়েরা, আবার ব্রতগীতি কুমারী মেয়েদের অধিকারে, বিবাহিতা মেয়েরা এ গান গায় না। পটুয়ার গান গায় পটুয়া। বেদের গান গায় বেদে। বৃদ্ধরা প্রেমের গান গাইবে না। কোথাও কোথাও গোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষ লোকগীতি গায়।

বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে ঝুমুর, গম্ভীরা, ভাটিয়ালী, বোলেন গান বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

মৈমনসিংহে 'গীতিকা' প্রধান লোকসাহিত্য। আবার উত্তর বঙ্গে কৃষাণ গান বৈশিষ্ট্যময়। নদীয়ায় দোলান গানে একটা ঐতিহ্য দেখতে পাওয়া যায়, এরূপ এক এক অঞ্চলে এক একটা লোকসঙ্গীত বিশিষ্টতায় মণ্ডিত। ঘাটুগান পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অনেক অঞ্চলেই শুনতে পাওয়া যায়। ঘাটুগানেও জাগগানের মত শ্রীকৃষ্ণ প্রধান গান। ঘাটু শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। সম্ভবত ঘাটের গান থেকেই ঘাটু গানের উৎপত্তি।

ঘাটু গানের সুরে বৈষ্ণব কবিতার সুর লক্ষ্য করা যায়।

দলবদ্ধ ভাবে যে গান গীত হয় জারী গান তাদের অন্যতম। জারী বাংলার মুসলমান সমাজের চিরপ্রিয় করুণাত্মক গান।

নৌকা বাইচ খেলার সময় পশ্চিমবঙ্গে সারিগান গাওয়া হয়ে থাকে।

মালদহের গম্ভীরা গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাদো দেবীর পূজা উপলক্ষে বাগদীরা বীরভূমে ভাদোর গান গায়। ভাদোর উৎসবের অনুরূপ উৎসব ওরাঁওদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ঝাপুগান, গাজন-গান, পটুয়ার গান, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে সমৃদ্ধ বাংলার লোকসাহিত্যের সঙ্গীতবিভাগ।

ফকির, বৈরাগী, বৈষ্ণবীর দল এক লোকসঙ্গীত ফেরী করে ফেরে। নৌকায় মাল্লা, মাঝি ভাটিয়ালী সুরে গান গেয়ে নির্জনতাকে অপূর্ব মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে। অন্দরমহলে মেয়েরা গায় বিয়ের-গান, মেয়েলী গান; আর বহির্জগতে পুরুষেরা লাঠি খেলে গান গায়, বেয়ারারা সুর করে পাল্কী বয়। চট্টগ্রামের মাইজ ভাণ্ডারে শিক্ষিত মুসলমানরা ফকিরী গান গায়।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি 'গানের দেশ বাংলা দেশ'। এই অজস্র লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে 'ছড়ার' মতই আরও বিচিত্র ভাবে বাংলার জাতীয় সাহিত্য রামকথা ও ভারতকথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; রামায়ণের নামতত্ত্ব, যুদ্ধ-কাহিনী সীতার করুণ বেদনার ইতিহাস আর মহাভারতের কর্ণ, দ্রৌপদী, নল-

দময়ন্তী-সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি কাহিনী, কাহিনীর অংশবিশেষ-বিভিন্ন চরিত্রের নব-রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। পল্লী-কবি রামকথা-ভারতকাহিনীকে আপন সুষমায় মণ্ডিত করে, আপন উপলব্ধির পরিমণ্ডলে আবৃত করে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এই সব লোকগাথা, লোক-সঙ্গীত আমরা শুনি, এর প্রাণশক্তি উপলব্ধি করে ঐতিহ্যময় গভীরতা অনুধাবন করতে চেষ্টিত হই। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় আমাদের জাতীয় জীবনের, আমাদের সংস্কৃতির কত গভীরে যে মূল বিস্তার করেছে, লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা তা আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

সমৃদ্ধময় লোকসাহিত্য এই দুই মহাকাব্যের লৌকিক প্রভাবে আরও সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। সভ্য মানুষ আবার নতুন করে এই লৌকিক সাহিত্যকে, তার সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করেছে। আবার বরণীয় হয়ে উঠেছে বাংলার অবহেলিত লোকসাহিত্যের সঙ্গীত বিভাগটি।

পার্বণাদি উপলক্ষে গীত

ব্রতকথা

বাঙালী মেয়ের আদিম ধর্মাচরণ ব্রত। ব্রতানুষ্ঠানে সাধারণতঃ ছড়া ও সঙ্গীত উচ্চারিত হয়। লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে রচিত হয় ব্রত-গীতি ও ব্রতকথা। ব্রতকথা পুরাতন কাব্য, ধর্ম ও কর্মের ইতিহাস। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "ধর্মাচার অবলম্বন করিয়া ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে—যে কোন সময় যথেচ্ছ ভাবে ইহাদিগকে আবৃত্তি করা হয় না। অর্থাৎ ইহারা বাঙালী হিন্দুর একটি আনুষ্ঠানিক মূল্য লাভ করিয়াছে।"[১]

মেয়েলী গান, বৈশাখী ব্রত

পশ্চিম বাংলায় 'বৈশাখী ব্রত' নামে মেয়েদের একটি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্রত সাধারণতঃ কুমারী মেয়েরা পাঁচ বছর বয়স থেকেই আরম্ভ করে। চৈত্রমাসে সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ করে বৈশাখ মাস ভোর এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। চার বৎসর এই ব্রত পালন করার পর উদ্‌যাপন করতে হয়।

পিটুলী দিয়ে দশটি পুতুল এঁকে, তাতে ফুল কিংবা দূর্বা দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। এ ব্রতকে 'দশ পুতুলের ব্রত'ও বলা হয়।

নিম্নের ব্রতের মন্ত্রটিতে কুমারী মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে, আর রামায়ণ, মহাভারতের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের অধিকারিণী হওয়ার স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জীবনের কামনা রূপায়িত হয়েছে,—

এবার মরে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব।
এবার মরে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব॥
এবার মরে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।
এবার মরে মানুষ হব, দশরথের মত শ্বশুর পাব॥
এবার মরে মানুষ হব, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
এবার মরে মানুষ হব, কুন্তীর মত পুত্রবতী হব॥
এবার মরে মানুষ হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।
এবার মরে মানুষ হব, পৃথিবীর মত ভার সব॥
এবার মরে মানুষ হব, ষষ্ঠীর মত জেঁওজ হব॥২

সেঁজুতি ব্রত

কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে সারা অগ্রহায়ণ মাস বিকেলে সেঁজুতি পূজা হয়। পিটুলির আল্পনায় ঘরের দালানে বা উঠানে সেঁজুতির ছবি আঁকা হয়। সেঁজুতির ছবির চার পাশে ছটি পুতুল এঁকে তাতে দূর্বা দিয়ে সেঁজুতির ব্রতের মন্ত্র গানের মত উচ্চারণ করে মেয়েরা। সেঁজুতি ব্রতের মন্ত্র প্রায় বৈশাখী ব্রতের ন্যায়। এ-ব্রতের গানেও বাংলা মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের অধিকারিণী হওয়ার স্বপ্ন কিশোরীমনে লুকিয়ে আছে।

টুসু

পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে তুষু বা টুসুর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। মানভূম জেলার সংলগ্ন বাঁকুড়া জেলায় এর নাম তুষু, সেখানে পোড়া মাটির সরার উপর প্রদীপ সাজান হয়, মাঝে ধানের তুষ দেওয়া হয়, তার উপর ফুলের মালা, কড়ি ও গুঞ্জার হার দিয়ে সাজান হয়। সরায় তুস দেওয়া হয় বলেই হয়ত এ অঞ্চলে এর নাম 'তুষু' দেওয়া হয়।

মানভূম জেলায় এ দেবতার নাম টুসু। এই জেলায় টুসু পূজা ব্যাপক,—একটা জাতীয় উৎসবের আকার ধারণ করে। মানভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর রূপও ভিন্ন। কোথাও একটি গর্ত, কোথাও সরা, কোথাও প্রদীপ বসান-সরা, কোথাও বাঁশের ডালা, কোথাও প্রতিমা, আবার কোথাও বা চৌল। গর্ত, সরা, প্রদীপ বা ডালায় বিজোড় সংখ্যায় গোবরের ও পিটুলির গুটি রাখা হয়।

টুসু গানে সমসাময়িক সমগ্র সমাজের একটা ছবি প্রতিফলিত হয়। টুসু-গান নারী সমাজের মধ্যেই প্রচলিত।

পৌষ মাসে সংক্রান্তিতে টুসুর ভাসান হয়। টুসুর পূজার পর গান গাওয়া হয়। পৌষ মাসের প্রথম থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি রাতে গান গেয়ে টুসুকে জাগিয়ে রাখা হয়। গান সাধারণতঃ ঘন্টা দুয়েক গাওয়া হয়।

নদীয়া জেলায় টুসু গানের দুটো দল থাকে। দু-দলে ঝগড়া করে টুসু ঠাকুর বিসর্জন দেয়।

নীচের গানে অশোক বনে সীতার অবস্থান ও রাবণের সীতাহরণের কাহিনী স্থান পেয়েছে।

অশোক বনে
তালের কুঁড়ে,
টুসু পাশা খেলিছে
যোগীর বেশে রাবণ এসে
সীতা হরে নিয়েছে ।[৪]

—চকবিহারী, নদীয়া।

মহাভারতের অর্জুন-সারথি-কৃষ্ণ কথা এই টুসু গানে চিত্রিত হয়েছে অপূর্ব ছন্দ মাধুর্যে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সারথি অর্জুন।

শ্রীকৃষ্ণের সারথি অর্জুন
রথ চালায় ভাল গো।
ঘোড়ায় টান রথে অর্জুন
যুদ্ধ করতে গেল গো ॥[৫]

— চকবিহারী, নদীয়া।

লঙ্কায় রাবণ রাজা টুসু পূজা করে। টুসু গানে অদ্ভুত ভাবে রামকথার প্রভাব।

লঙ্কাপুরে রাবণ রাজা
সে করে টুসুর পূজা।
থালায় লয়ে ফুল বাতাসা
হাতে লয়ে জিলিপি গজা ॥[৬]

—চকবিহারী, নদীয়া।

টুসু গানে নানা সমস্যা

রাঢ় অঞ্চলের টুসু গান লৌকিক শস্যোৎসবের গান। যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান পেকে উঠে, ঘরে ঘরে নতুন ধানে ভরে উঠে গোলা, তখন এই উৎসব আরম্ভ হয়। পশ্চিম বাংলার অনেক জেলায় এই গান আর উৎসব 'তুষ-তুষলীর ব্রত নামে পরিচিত।

এই তুষ-তুষলীর ব্রতই বাঁকুড়া, নদীয়া আর পুরুলিয়ায় 'টুসু' উৎসবে পরিণত হয়েছে।

'বাঁশ পাহাড়ীটা ভাল ছিল
বন কেটে খারাপ হল,
ভীম-অর্জুন খাল ভরায়া
টাকায় সিকি লাভ নিল।
বর্ণ শাড়ী সামিজ না হলে,
আমরা কি পরে যাই পর কুলে॥"৭
—বাঁশপাহাড়ী।

কর্মসঙ্গীত ঃ সারি গান

কর্মই মানুষের জীবন। কাজের মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং চাষী চাষ করার সময় যে গান গায়, তাকেই কর্ম-সঙ্গীত বলে। কাজের সময় গান গেয়ে কর্মী কাজ করে। কাজে আনন্দ পায়। আসাম, দার্জিলিং-এ মেয়েরা যখন চায়ের পাতা গাছ থেকে তোলে, তখন সারা চা-বাগান এক রোমান্টিক সুর-সুষমার সৃষ্টি করে তারা। মজুর যখন ছাদ পেটে সুর করে গান গায়, ছন্দের তালে তালে ছাদ পেটা চলে। নদী-মাতৃক দেশে যখন গ্রামের ছেলেরা নৌকা বাইচের খেলা করে প্রতিযোগিতায় নামে, তখন তারা গান গায়; এ গানও কর্ম-সঙ্গীতের অন্তর্গত। এ গানকে সারি গান বলে।

এই সারি গানেও রামকথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'কানু ছাড়া গীত নাই'—এ যেমন প্রবাদে পরিণত হয়েছে, তেমনি 'রাম' ছাড়া যেন বাঙালীর লৌকিক জীবনের কোন সঙ্গীত নেই।

কর্মের অবসরে বাঙালী রামকথাকে তার একান্ত আপনার করে নিয়েছে, তার সাংস্কৃতিক জীবন রামকথার প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত। নৌকা বাইচের

প্রতিযোগিতায় জয় লাভের পর গ্রামের ছেলেরা যখন গ্রামে ফিরে আসে, বৈঠাক তালে তালে তখন তারা গায়, এ গানে লৌকিক গোপাল কৃষ্ণ আর রাম একাকার হয়ে যায়।—

(১) "জয় দেলো, রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে।
ধান্ত দূর্বা বরণ কুলা দেলো ঐ গলুয়ার কপালে ।।
নাড়িয়া বরিয়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে।
জয় দেলো, রামের মা, তোর গোপাল আইছে ঘরে ।।
সাত সাগরের পারখিকা যে আনৃছে বরণ মালা।
দুধের বাটী ক্ষীরের নাড়ু আনো আনো থালা থালা
যেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে,
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম যাই তারে ।।"৮

(২) "জটা বাকল পরে রাম যাবি রে বনে।
কেমন সহিব, ওরে বাছা ধন ।।
নির্বুদ্ধি রাজা বুদ্ধিতে, কেন যাবি বনেতে।
শ্রীবশ রাজা কেন করেছিল পণ। "৯

—মুর্শিদাবাদ।

(৩) "ওসে ধুলায় পড়ে কান্দে রানী মন্দোদরী।
কাঁচা চুলে হলাম আমি রাঁড়ী ।।
রাজা কেন যুদ্ধে গেল।
যুদ্ধে গিয়ে প্রাণ হারালো।
রাম লক্ষ্মণ পাঠাইল যমপুরী ।।"১০

—মুর্শিদাবাদ।

পটুয়ার গান : রামলীলা

পশ্চিম বাংলায় মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এক বিশেষ ধরনের লোক-সঙ্গীত চলিত আছে। পল্লী অঞ্চলের বিশেষ এক সম্প্রদায় পটে আঁকা ছবি গ্রামের ঘরে ঘরে প্রদর্শনী করে ফেরে। চিত্রিত ছবির মর্ম অনুযায়ী বৈচিত্র্যহীন সুরে পটুয়া গান গায়। এ-গানকে 'পটুয়ার গান' বলা হয়।

যুগের প্রভাব এই পটুয়ার গানে লক্ষ্য করা যায়। অতীতের পটুয়া একদিন যে গান গেয়ে ফিরত, আজ কালের প্রভাবে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব তত্ত্ব বা ভাগবত প্রসঙ্গ এখন এই গানে প্রভাব বিস্তার

করেছে। কোথাও কোথাও রামকাহিনীও বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত। কোথাওবা মনসা মঙ্গলের কাহিনী পটুয়ার গানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমান সঙ্গীতে রামকথা বর্ণিত হয়েছে। পটুয়ার গানে রামলীলা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর লোকসঙ্গীত রত্নাকর (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "রামায়ণের কাহিনীই জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে যে ঐশ্বর্যগুণের অস্তিত্ব ছিল, তাহা এদেশে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের প্রভাববশত সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া উভয়ের মধ্যে আর কোন পার্থক্য অবশিষ্ট রহিল না। তবে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ যেমন রস প্রধান, রামকাহিনী তেমন নহে। তাহার মধ্যে একদিকে কাহিনী এবং আর একদিকে পারিবারিক কর্তব্যের প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সেইজন্য ইহার রচনা অনেকটা সংযত। এখানে সিন্ধু মুনি বধের বৃত্তান্তটি বর্ণিত হইয়াছে॥"[১১]

"রাজার পুত্র নামে দশরথ
সভা করে বসে আছেন যত প্রজাগণ।
প্রজাগণে বলে, রাজা, শুন মহাশয়,
রাবণকে জেনিতে পারলে রথ যাত্রা হয়।
রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল,
জটাই পক্ষী রথ ধরে নামাইল।
তুমি আমার মিতে, জটা, তোমার আমি মিতি।
বিপদকালে উদ্ধার করলেন মনে রেখো মিতি।
দেখ, বনে থাকি বনের পাখী আমি বনের মৈত্রতা জানি।
আমার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাইলে তুমি।
নিজের গলায় পুষ্পের মালা জটার গলে দিলেন,
এই খানেই থাক জটা বনের রথ আগলাইয়ে।
আমি আসি কানন বনে মৃগ শিকার করি।
নিলে ঘোড়া জামা জোড়া পায়তে পামরি,
গলাতে তুলসীর মালা নন্দ পাগলি।
একাদশী করিয়াছে বনের অন্ধক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
পারনের জল আনতে যাও, গুণের সিন্ধুমুনি।
নিত্য নিত্য যাই পিতা সরোবরের ঘাটে।
আজতো যাবো না পিতা কি আছে কপালে।
যাওরে বাপ, গুণের সিন্ধু কররে গমন।
কালকে গিয়াছে একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভোজন।

কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু গাড়ু নিল হাতে।
অন্ধত্যাতে জল পুরিতে গেলেন সরোবরের ঘাটে।
চৌদিকে ঘুরে বেড়ালেন শিকার নাই মেলে।
জলপড়া শব্দ রাজা কর্ণেতে শুনিলেন।
বনের মৃগ বলে কর্ণেতে বাণ বিঁধিলেন।
কে মেলিলে দুরন্ত বাণ আমার অঙ্গ গেল।
বাপরে বলে শিশু পড়লেন সরোবরের জলে।
ব্রহ্ম হত্যা গুরু হত্যা বলে করিলাম স্মরণ ন।
এই বন মাঝারে তিনি কে ডাকিবেন মা।
পাতার মচমচানী শব্দ শুনতে পাই আপন কর্ণে।
কে বলিবে গুণের শিশু এ করি কোলে।
তোমার শিশু বটে মুনি আমার নাম দশরথ।
না জানিয়া বধ করেছি তোমাদের নন্দন।
কি শোনালে রাজা দশরথ, কি বেরিল মুখে।
বজ্রাঘাত ভেঙ্গে পড়িল অন্ধমুনির বুকে।
সাত নয়, পাঁচ নয় আমার একা শিশু মুনি।
ক্ষুধার সময় এনেছিলেন ক্ষীর সহ নবীন।
দেখ মাঠের মধ্যে এক বৃক্ষ সেই তো মাঠের মাথা।
একলা মায়ের পুত্র—মা দাঁড়াইয়াছেন কোথা।
হায়! হায়! বলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কপালে মারেন ঘা।
কোথায় রে বাপ, প্রাণের শিশু মায়লে ডাক।
পুত্র বর পাবি রাজা নিপুত্র হবি।
চারপুত্র পাবি রাজা, রাম, লক্ষ্মণ, যাবে তোর বন।
ভরত শত্রুঘ্নকে থুয়ে ত্যজিবে জীবন।
একজন মেলিনে রাজা, মেলেন গো তিনজন।
তিন জনায় সৎকার্য করগো এখন।
চুয়া, চন্দন, মধু, ঘৃত, দিয়া দাহন সাজাইলেন।
মাতা, পিতা, পুত্রের সৎকার্য এক বিলে করিলেন এখন।
মুনি সকল দিয়ে ডাক দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।
শত শত শাস্ত্রের বচন বলিতে লাগিলেন।
সেই যজ্ঞ চরু নিয়ে দশরথ দিলেন,—

আবার সেই যজ্ঞের চরু নিয়ে কৈকেয়ী,
সুমিত্রা, কৌশল্যাকে দিলেন।
সেই যজ্ঞের চরু খেয়ে রামের জন্ম হল,
এই কথা শুনে রাজা আনন্দিত হইলেন।
দশ মাস দশদিন পরিপূর্ণ হইলেন।
কুলে ফুলে গুণে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত. শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন।
দাইরূপে যশমোতি দুই হাত পেতে দিলেন।
সুবর্ণের চাকুতে নাড়ী ছেদন করিলেন।
আউলি ঝাউলি দিচ্ছেন রাজা দশরথের কোলে,
লক্ষ লক্ষ চুমু খাই বদন ভরিয়ে।
ছেলে দুলে মায়ের কোলে বাড়িতে লাগল।
একমাস, দুই মাস, তিনমাস হলেন,
এই কথা শুনে রাজা বড়ই আনন্দিত হইলেন।
মুনি সকল ডাক দিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।
শ্বেত কাক দিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করিলেন।
মুনিরা সব প্রাণের ভয়ে পলাইল দেশ দেশান্তরে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেলেন. রাম-লক্ষ্মণ আনিবার তরে।
আমার সঙ্গে রাম পাঠাইতে জীবন কাতর,
নিজ মুখে বলবি যে দিন রাম যাবে বন।
পরের পুত্র মেরে যেমন রাজা পরের প্রাণ কাঁদালি।
এখন নিজ পুত্র বনে দিয়ে নিজ প্রাণ ত্যজিবি।
চারপুত্র, আছে ঘরে তোর—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন।
রাম লক্ষ্মণকে বনে দিয়ে ত্যজিবি জীবন
ধান দূর্বা দিয়ে রাজা বাড়ি করে ছিলেন।
কতক দূরে গিয়ে মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন।
যাও দেখি মুনি কোথায়, পথের ভয় পরিচয়
ছয় দিনের পথে আছে তাড়কা রাক্ষস।
ছয় মাসের পথে আছে যজ্ঞে দরশন।
আমার সঙ্গে রাম পাঠাইতে তোর জীবন কাতর
নিজ মুখে বললেন খুলে রামকে দিলাম বন।
চোখে মুখে অগ্নি উঠে ধিকে ধিকে।

মুনির শাপে রাজা তখন অযোধ্যা পুরীতে।
যাওরে রাম-লক্ষ্মণ যাও মিথিলার বন।
চার পুত্র আছে মোর তোর রাম-লক্ষ্মণ-যাবে বন।
ভরত শত্রুঘ্নকে মুয়ে ত্যজিবি জীবন।
উপরে রয়েছে রবির তাপ, নীচে খর বালি।
চলিতে না পারেন রাম প্রাণের বিকুলি।
রাম ধর না তরুডাল, লক্ষ্মণ ধরো গা শিরে।
ইয়ার, ইমার, বলে রাম যাও ধীরে ধীরে।
ছয়মাসের পথে যাবো না, মুনি, ছয় দিন চলে যাব।
কেমন যে তাড়কা বধ দুই ভায়ে দেখিব।
তাড়কাকে দেখে রঘুনাথ ধৈনুকে জুড়লেন বাণ।
শত শত বাণ মারে তত তাড়কা ধরে ধরে খাই।
রাম লক্ষ্মণ বনে তখন তাড়কা বধ হয়।
তাড়কাকে বধ করে মিথিলা করে গমন।
পার কর পার কর মাঝি বেলা হয়ে যাই।
মিথিলা নগর চলো করে যাচ্ছি রামকে নিয়ে।
গৌতম মুনির শাপে অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিলেন।
রাম লক্ষ্মণ চরণ পেয়ে অহল্যা উদ্ধার হয়ে গেলেন।
এইখানে থাক আমার রাম-লক্ষ্মণ দর্শন।[১২] —মুর্শিদাবাদ

লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময়তা : গৌর পদাবলী

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে এক বিপুল ধর্ম আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিণামে বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগ প্রবর্তিত হয়েছিল। চৈতন্য-ধর্মের প্রভাবে বাংলার সমাজ জীবনে কৃষ্ণলীলার পরিবর্তে গৌরলীলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 'গৌর পদ তরঙ্গিনী'তে গৌর-বিষয়ক পদ, মহাজন পদ স্থান লাভ করেছে। এ ছাড়াও বাংলার বিপুল সংখ্যক পদ আজও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লোক মুখে প্রচারিত হয়ে গৌর জীবনের জনপ্রিয়তা নির্দেশ করছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাংলার লোক-সংস্কৃতির রূপান্তর সাধন করেছে।

বর্তমান সঙ্গীতটি বাউল সঙ্গীতের মতই গীত হয়।

মহাভারতের প্রহ্লাদ চরিত্রের কথা এ গানে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব কবি শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার রূপে কল্পনা করেছেন।

(১) গৌর বলে ডাকরে তারে মন রসনা।
গৌর বলে ডাকতে পারলে কারো
নিষেধ মানবে না।
গৌর দয়াময়—
শুনি বেদ পুরাণে কয়।
জগাই মাধাই উদ্ধারিল এসে নদীয়ায়।
এই দেখ জগাই মাধাই তারা দুই ভাই—
চরণ পেল দুজনায়।
গৌর বলে ডাকতে পারলে হয়,
গৌর হবে না নিদয়।
প্রহ্লাদ ডেকেছিল তারে, দিলেন পদাশ্রয়,
গৌর হরিবোল, হরিবোল বলে
প্রহ্লাদ অগ্নিজলে মল না।
এই দেখ ত্রেতা যুগেতে
শিলা ভাসে জলেতে।
ভক্তিগুণে পাষাণ মানব পদরেণুতে।
গৌর ভক্তের জন্য শ্রীচৈতন্য,
কাঠের তরী হল সোনা।
গোসাই মদন কয় হায়রে চণ্ডী
ভুলিসনা তারে
দীন হীন অনাথ প্রতি দয়া সে করে।
গোসাই রামানন্দের চরণ
স্মরণ কেন নিলি না।[১৩] —গোপালপুর, নদীয়া।

(২) জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র
চরণার বিন্দু দাও হে আমায়।
সর্ব গুণাকর পরম ঈশ্বর
পতিতকে তরাইবে আর কেহই নয়,
জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র
শ্রীচৈতন্য করিলেন ধন্য,

মুনির শাপে রাজা তখন অযোধ্যা পুরীতে।
যা ওরে রাম-লক্ষ্মণ যাও মিথিলার বন।
চার পুত্র আছে মোর তোর রাম-লক্ষ্মণ-যাবে বন।
ভরত শত্রুঘ্নকে মুয়ে তাজিবি জীবন।
উপরে রয়েছে রবির তাপ, নীচে খর বালি।
চলিতে না পারেন রাম প্রাণের বিকুলি।
রাম ধর না ভরতাল, লক্ষ্মণ ধরো পা দিয়ে।
ঈয়ার, ঈয়ার, বলে রাম যাও ধীরে ধীরে।
ছয়মাসের পথে যাবো না, মুনি, ছয় দিন চলে যাব।
কেমন যে তাড়কা বধ দুই তারে দেখিব।
তাড়কাকে দেখে রঘুনাথ ধৈনুকে জুড়লেন বাণ।
শত শত বাণ মারে তত তাড়কা ধরে ধরে খাই।
রাম লক্ষ্মণ বনে তখন তাড়কা বধ হয়।
তাড়কাকে বধ করে মিথিলা করে গমন।
পার কর পার কর মাঝি বেলা হয়ে যাই।
মিথিলা নগর চলো করে যাচ্ছি রামকে নিয়ে।
গৌতম মুনির শাপে অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিলেন।
রাম লক্ষ্মণ চরণ পেয়ে অহল্যা উদ্ধার হয়ে গেলেন।
এইখানে থাক আমার রাম-লক্ষ্মণ দর্শন।[১২] —মুর্শিদাবাদ

লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময়তা : গৌর পদাবলী

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে এক বিপুল ধর্ম আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিণামে বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগ প্রবর্তিত হয়েছিল। চৈতন্য-ধর্মের প্রভাবে বাংলার সমাজ জীবনে কৃষ্ণলীলার পরিবর্তে গৌরলীলা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জগবন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 'গৌর পদ তরঙ্গিনী'তে গৌর-বিষয়ক পদ, মহাজন পদ স্থান লাভ করেছে। এ ছাড়াও বাংলায় বিপুল সংখ্যক পদ আজও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লোক মুখে প্রচারিত হয়ে গৌর জীবনের জনপ্রিয়তা নির্দেশ করছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাংলার লোক-সংস্কৃতির রূপান্তর সাধন করেছে।

বর্তমান সঙ্গীতটি বাউল সঙ্গীতের রূপেই গীত হয়।

মহাভারতের প্রহ্লাদ চরিত্রের কথা এ গানে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব কবি শ্রীগৌরাঙ্গকে অবতার রূপে কল্পনা করেছেন।

(১) গৌর বলে ডাকরে তারে মন রসনা।
গৌর বলে ডাকতে পারলে কারো
নিষেধ মানবে না।
গৌর দয়াময়—
শুনি বেদ পুরাণে কয়।
জগাই মাধাই উদ্ধারিল এসে নদীয়ায়।
এই দেখ জগাই মাধাই তারা দুই ভাই—
চরণ পেল দুজনায়।
গৌর বলে ডাকতে পারলে হয়,
গৌর হবে না নিদয়।
প্রহ্লাদ ডেকেছিল তারে, দিলেন পদাশ্রয়,
গৌর হরিবোল, হরিবোল বলে
প্রহ্লাদ অগ্নিজলে মল না।
এই দেখ ত্রেতা যুগেতে
শীলা ভাসে জলেতে।
ভক্তিগুণে পাষাণ মানব পদরেণুতে।
গৌর ভক্তের জন্য শ্রীচৈতন্য,
কাঠের তরী হল সোনা।
গোসাই মদন কয় দেরে চণ্ডী
ভুলিসনা তারে
দীন হীন জনার প্রতি দয়া সে করে।
গোসাই রামানন্দের চরণ
স্মরণ কেন নিলি না।[১৩] —গোপালপুর, নদীয়া।

(২) জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র
চরণার বিন্দু দাও হে আমায়।
সর্ব গুণাকর পরম ঈশ্বর
পতিতকে তরাইবে আর কেহই নয়,
জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র
শ্রীচৈতন্য করিলেন ধন্য,

পূর্ণ অবতীর্ণ হলেন নদীয়ায়।
সড় ভুজা অঙ্গ
হইলেন গৌরাঙ্গ
তার বিধির ভাব কিছুই বুঝা নাই যায়।
সত্য যুগেতে হরি
হইলেন বলির দ্বারী,
রামরূপে সনচারী
হইলেন ত্রেতায়।
বীরভূ প্রকাশ বীর চক্রপুরে বাস।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে
জন্মিলেন তথায়।
সুন্দর যমুনার তীরে-
গড় বাঁশের ঘরে
বোল গাছের নীচে
নাড়ী পোতা আছে তায়,
দ্বাপরেতে সে ব্রজপুরীতে
বাঁশির গানে ভোলায়
যত গোপীকায়।
কালিয়া দমন করিছে স্মরণ
অভয় চরণ দিয়ে
কেশবের মাথায়।[১৪]

—তেহট্ট, নদীয়া।

(৩) যুগে যুগে মায়ের প্রাণে যেই বাদছায়
তুমি করলে বারম্বার,
এত নিন্দাধম, নতুন কম, নয় হে গৌর তোমার।
কর না গৌর এমন ব্যবহার।
হয়ে বামন অবতার, গেলে বলির যজ্ঞাগার,
আসবে বলে বলে গেলে আসলে নারে আর।
তার কারণ অদিতি করে
ঘরে বইস্যা হাহাকার।

করনা, গৌর, এমন ব্যবহার।
হয়ে পরশুরাম অবতার,
মাথা কাটিলে রেণুকার,
যেই মাতা, সেই পিতা আছে কয় শেষে প্রচার—
এমন কাজ কি পুত্রে করে শুইন্যা লাগে চমৎকার,
কর না গৌর এমন ব্যবহার।
সেই রাম রূপে ত্রেতা, কাঁদালো কৌশল্যা মাতা
সে সময়ে আমি সঙ্গী ছিলামরে তথা,
মায়ের চক্ষের জলে বক্ষ ভিজে হয়েছিল শত ধার—
করনা গৌর, এমন ব্যবহার।
তুমি দ্বাপরে আবার হয়ে পুত্র যশোদার
আমারে লইয়া গেলে, কংসের যজ্ঞাগার।
মায়ের কাইন্দা নয়ন অন্ধ হৈল
সেই গেলে এলে না আর,
কর না গৌর এমন ব্যবহার।[১২]

—মৈমনসিংহ।

বাউল

"বাউলের জন্ম চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধ ও মুসলমান ফকির হইতে। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে বাউল যথেষ্ট প্রবল ছিল।"[১৩]

শ্রদ্ধেয় চারু বন্দোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় বাউল সম্পর্কে বলেছেন, "একটা বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত 'আছে' এই অর্থ-দ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন, এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগ-শাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সাধন করিবার সাধনা করেন, তাঁহারা বাউল। কেহ বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ জীবন ধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাহারা, তাঁহারা বাউল। আবার কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রকৃত রূপ বাউল। যাহারা বাতাধিক তাঁহারা

পাগল, যাহাদের আচরণ সাধারণ তুল্য নহে তাঁহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে, এরূপ সাধারণ সমাজ বহির্ভূত ব্যবহার সম্পন্ন ধর্ম সম্প্রদায় বাউল।"

বাংলার ভ্রমণশীল ও ভিক্ষাজীবীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলার পাল রাজাদের শেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "এই দেহটাই সব, এই দেহ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র অনুকরণে স্বর্গ নরক আছে। আমাদের দেশে যারা ভিক্ষা করে, এরা বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ন।"[17]

শূন্য-বাদের পর সহজ মতবাদ সম্পর্কে পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেন,— "বৌদ্ধ সহজ মানে সিদ্ধেরা বলেছেন—সহজে ভাব অভাব নাই, পাপ পুণ্য নাই, রাগবিরাগ নাই, সহজ স্বভাবতঃই নির্মল, এই সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হ'লে স্বপ্ন, ভূত আর মন ও ইন্দ্রিয় অর্থাৎ উপাধি সকল নষ্ট হয়, ... ।"[18]

শূন্যবাদ, সহজবাদ, আর শক্তিবাদ মিলিয়ে তবে বাউলকে পাওয়া যায়। বাউলের পরিচয় তার গানে। অন্য কোথাও নয়। বাউল নিজের গাওয়া গানে নিজের পরিচয় দেয়,—

"তাইতে বাউল হইনু ভাই
এখন লোকের বেদের ভেদ বিভেদের—
আর তো দাবী দাওয়া নাই।"

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতকে বাউলগান শিক্ষিত সমাজকেও আকৃষ্ট করেছিল। সে সময়ে বহু শিক্ষিত লোকেও বাউলগান রচনা করেছিলেন। বাউলগান পশ্চিম বাংলার বড় আদরের সম্পদ। এ সম্পদ ছড়িয়ে আছে গ্রাম বাংলার পথে ঘাটে। পশ্চিম বাংলায় বাউলের প্রধান কেন্দ্র নদীয়া জেলায়। নবদ্বীপে নদীয়া-বিনোদই বাউলদের আধ্যাত্মিক গুরু।

পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলা দেশ) বাউল শব্দটির সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিশেষ পরিচয় নেই। 'পূর্ববঙ্গে ইসলাম কাঠামোর উপর রং চড়িয়ে ভিখারী বাউল হয়েছে ফকির। পশ্চিম বঙ্গে বৈষ্ণব কাঠামোর উপর চুনকাম করে বোষ্টম হয়েছে বাউল।' উত্তর বঙ্গের বৌদ্ধ শিষ্য এখন বাউল নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও বাউলগানকে বলা হয় 'শব্দ' গান। উত্তর ভারতে কিছু কিছু দোঁহা জাতীয় গানকেও 'শব্দ-গান' বলা হয়।

পূর্ববঙ্গে ভাটিয়াল গান আর বাউল গানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, তবে সুর আর বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভাটিয়াল শব্দ সম্ভবতঃ ভাটি শব্দ থেকে এসেছে। গোপীচন্দ্রের গান পাই, "ভাটা হইতে বাঙাল লম্বা লম্বা দাড়ী।"

ভাটিয়াল গান বলতে পূর্ববঙ্গের নদীতে, নির্জন প্রান্তরে লোকসঙ্গীত হিসাবে যে গান বিশেষ পরিচিত, তাকেই ভাটিয়াল গান বলে। সাধারণ মানুষ ভাটিয়াল গান ও বাউল গানের পার্থক্য বিশেষ বুঝতে পারে না। ভাটিয়াল গান ও বাউল-গানের মধ্যে প্রভেদ খুব কমই চোখে পড়ে, প্রভেদ যা কিছু সুরে।

নদীয়ার বাউল সম্প্রদায় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। চৈতন্য প্রভাবে এ সঙ্গীতে গৌরতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব স্থান লাভ করেছে। চৈতন্যদেবের প্রভাব চৈতন্য-যুগে বাংলা লোক-সংস্কৃতিকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল,—বাংলার বাউল-গানে তার নিদর্শন মেলে।

বাংলার জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতকে বাদ দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তার প্রমাণ বাংলার লোক-সংস্কৃতির সম্পদ বাউলগান। বাংলার পথে, ঘাটে, হাটে, গঞ্জে আজও বাউলগান শুনতে পাওয়া যায়।—

"মন বুঝে কর পিরীত, পিরীতে হয় আরতি,
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ, পিরীতে হয় সারথি॥"

কেন্দুয়ার বাউল

(১) সুরীত, পিরীত, কুরীত—তিন পিরীতে তিনভাব,
পিরীতে যে মজে, হয় তার তেমন লাভ।
ভাবের পিরীত, অতি কুরীত, সুপিরীত কেউ করে না,
কোন পিরীতে প্রাপ্তি ঘটে, ঘট খুলে কেউ দেখে না।
মন বুঝে কর পিরীত, পিরীতে হয় আরতি।
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ, পিরীতে হয় সারথি।
শুদ্ধ প্রেমে হনুমান, রামপদে সঁপিল প্রাণ—
তার হৃদপদ্মে রামনাম।[১২]

(২) দেখবি যদি সোনার মানুষ,
দেখে যাবে মন পাগল,
অষ্ট রং গোলাপী বরণ, ষোল কলায় পূর্ণিমা।
তার কপালে আছে লক্ষণ
কৌতুকেতে অকৌতুক ধন—
রূপ দেখে হয় আনন্দ মদন হয়রে বেতালা।[১৩]

নদীয়ার বাউল : সাধন তত্ত্ব

(৩) অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করিবার তরে,
অধঃ দৃষ্টি করি ঊর্ধ্বের কার্য সারে।
মৎস্যচক্র কাটি পড়ে ভূমিতলে।
ব্রহ্মমতিসনে ব্রহ্মমতি রবে।[১১]

—গোপালপুর, নদীয়া।

প্রেমতত্ত্ব

(৪) না বুঝে প্রেমের দশা
মনে হয় মিথ্যের আশা,
কে নেবে সোনা— এই বাসনা,
ফিরেছে তাই তামা কাঁসা।
সত্য যুগে ছিল হরি,
গোপনে রাজত্ব করে,
মুনিরা সব ভক্তি যোগে
জ্ঞান স্বরূপে বনে বাসা।
ত্রেতা যুগে রাম রাবণে
শেষ কালে তার এমনি দশা।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণলীলা
কে বুঝিবে সে সব খেলা,
কংসকে নিধন করিলে
কৃষ্ণ সঙ্গে ভালবাসা।
কলিযুগে গৌর হরি
হরি হয়ে বলছে হরি,
চণ্ডী বলে ভেবে মরি
মলিন হয়ে জীবের দশা।[১২]

—গোপালপুর, নদীয়া।

(৫) ভক্তি প্রেমের মূল, যত্ন করে তোল,
তখন ফুলেতে ফলিবে
ফুলে আর ফলে
যেমন ত্রেতা যুগে ছিল
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তার প্রেমে বাঁধা ছিল,
পবননন্দন আর বিভীষণ।
গুহকে চণ্ডাল নয়
ভক্ত চণ্ডাল হয়।
গোসাঁই গৌর বলে
ভক্তিগুণে দয়াল রামকে পেলে।[২৩]
—গোপালপুর, নদীয়া।

(৬) পুত্রের কর্ম গুণ পিতার অজম্গুণ
পাণ্ডুকুল চন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি
যার আছে শ্রীকৃষ্ণ সারথি
তার কর্ম দোষে গেল বনবাসে
রাখিতে নারে কেশবে।
রামচন্দ্র ছিল পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,
যার সীতা হরে নিল দশানন,
তার স্বর্ণলঙ্কা পুরী হইল ছারখার,
বিধিলিপি কে খণ্ডাবে।
দেবাসুর মিলে সমুদ্র-মন্থনে
যার যেমন ভাগ্য সে তেমন পেলে।
নীলকণ্ঠ ভনে ভাবিতে অদৃষ্ট
কর্ম সূত্রে ফল মেলাইবে কৃষ্ট,
কর ওই পদেতে মন তুষ্ট নিষ্ঠ:
তোমার এ-ভব যন্ত্রণা যাবে।[২৪]
—গোপালপুর, নদীয়া।

(৭) মন কি তুমি চির জীবে
দিন কি তোমার এমনি যাবে।

দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে যেদিন
প্রাণ-বিহঙ্গ পলাইবে।
শ্মশানে শয্যাকারণ, ভেবে দেখ মন
সেতাকালে।
দেবেন্দ্র যার বাঁধিলেন দ্বার
যম বাঁধা যার অশ্বশালে।
ব্রহ্মা যার ছিলেন সঙ্গে
মা ছিলেন যার অভয় দাতা
করেছেন তিনি ত্রিলোক বিজয়।
অবশেষে নির্বংশ হল
ভীম অর্জুন দুর্যোধন
শত শত ভ্রাতা যার
কোথায় রে সে অভিমন্যু।
শ্রীগোবিন্দ মাতুল যার,
কোথায় সে রাজা কংস
কোথায় রে সে যদু বংশ
রবে না তার কোন অংশ
কালে ধ্বংস সবার হলে।
দারা সুত পরিবার
কারে ভাব কেবা কার।
সতীশ ভনে নয়ন মুদিলে পরে
সকলই হবে অন্ধকার।[২০] —গোপালপুর, নদীয়া।

চুয়া-গান

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে বাউল সঙ্গীতের মত বৈরাগ্যমূলক এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই গানকে 'চুয়া-গান' বলে। বাউল গানের মত 'চুয়াগানে' ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার অথবা মনের মানুষের সন্ধান লাভের কোন কথা নেই। পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশ) রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলায় যে, 'ধুয়াগান' প্রচলিত আছে এ-বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে 'চুয়াগানের' সঙ্গে তার কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ধুয়াগানের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে সংসারের অসারতার কথা। ধুয়া শব্দই বোধ হয় রাঢ়ের উচ্চারণে চুয়া হয়ে থাকবে।

পশ্চিম বাংলায় 'চুয়াগানের' সাধারণতঃ চারটে বিভাগ আছে। (১) বৈরাগ্য-মূলক, (২) দেহতত্ত্বমূলক, (৩) কৃষ্ণপ্রসঙ্গমূলক, (৪) লৌকিক।

বৈরাগ্যমূলক চুয়া-গান

জীবনের নশ্বরতার কথা উল্লেখ করে যে গানে পরলোকের কথা বলা হয়, তাকে সাধারণতঃ 'বৈরাগ্যমূলক চুয়া-গান' বলে। এ গান সাধারণ উদাসী বৈরাগীর গান। এই গান আধ্যাত্মিক বা দেহতত্ত্ব বিষয়ের গান।

উদ্ধৃত বৈরাগ্যমূলক 'চুয়াগানে' রামায়ণের যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বেদনাময় বিড়ম্বনার কথা স্থান পেয়েছে।

ওরে মন, ভাবিলে আর কি হবে।
ওরে যা আছে কপালে ফলবে কালে কালে।
কর্ম-সূত্রের ফল আপনি ফলে
ওরে মন ভাবিলে বল আর কি হবে।
ওরে বিধি যা লিখেছেন কপালের উপর,
কার সাধ্য তা খণ্ডাইতে পারে।
বলবুদ্ধি বিদ্যা কখন পারে।
যখন যা ঘটিবার তখন তা ঘটিবে,
ওরে পাণ্ডুকুলোদ্ভব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি—
যাদের রথের সদা শ্রীকৃষ্ণ সারথি
তারা কর্ম ফলের দুঃখী
হলেন বনবাসী,
রাখতে নারে কেশবে।
ওরে মন ভাবিলে কি আর হবে।
দেবাসুর মিলে সমুদ্র মথিলে,
যার যেমন ভাগ্য সে তেমন পেলে
ওই দেখ তার সাক্ষী হরি পেলেন লক্ষ্মী,
শিবের ভাগ্যে বল কি বা হল দেখরে,
ওরে মন ভাবিলে বল আর কি হবে।[২৭]

কবিগান

"বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি,—রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের প্রভাব কেমন করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আপামর জনসাধারণের মনের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধ সঞ্চার করিয়াছে, বাংলার কবিয়াল সম্প্রদায়ই তাহার চমৎকার প্রমাণ।"৭৭ কেবলমাত্র কবিগানের উল্লেখ ও সেই কবিগানের মাধ্যমে বাংলার আপামর জনসাধারণের অন্তরে বাংলার লোক সংস্কৃতির প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

বণিকশ্রেণী সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আশে পাশে প্রতিভাবান কবির দলের আবির্ভাব ঘটেছিল। কবিগানকে কোন কোন গবেষক লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান না, আবার এর মধ্যে যে সমস্ত সঙ্গীত লৌকিক-সংস্কৃতির বাহন হয়ে আজও লোকমুখে প্রচারিত, সেই সব সঙ্গীতকে তাঁরা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

উদ্ধৃত গানে শূর্পণখা ও লক্ষ্মণের লৌকিক কাহিনী স্থান লাভ করেছে।

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আজও লোককবিরা কবিগান গেয়ে থাকেন। রামকথা এ গানের মুখ্য বিষয়বস্তু।

আছে কত রাজার সুন্দরী নারী
তারে অসুখ কি তোমার,
তোমার শূর্পণখা ভগ্নী বোকা
লঙ্কাতে আনলে জানকী,
নাক কাটা সে, ভগ্নী তোমার
তার নাকি স্বামী বেঁচে নাই।
কে পুরাবে মনের সাই।
বেড়ায় সে বনে, মদন সদাই হানে
রামকে দেখে তোমার বোনের চাপলো কামেরবাই।
তোমার বোন গিয়েছিল সেই শ্রীরামের কাছে,
লক্ষ্মণ ঠাকুর নাকটি কেটে নাক বাজালো দেখ না,
বললে কেন মন্দ কথা ভগ্নী তোমার
বোনের কথা শুনে শুধের রামকে কষ্ট দিও না।
একটা বানর এসেছিল সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছিল
তাকে দেখলে তাই বল
আবার পাল শুদ্ধ ঢুকবে যখন লঙ্কাপুরেতে,

তখন তোমার নারী মন্দোদরী
পালাতে পার পাবে না।
কিছু দিন বাঁচবি, পালাব সখি
রামের সীতা রামকে দিয়ে
বিদায় করিসনা।।[২৮] —মুর্শিদাবাদ।

এই কবিগানে সীতা হরণে রাবণের পরিণতি ও লঙ্কার ধ্বংস-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ওহে দশানন, ঘোর মরবার ঔষধ বাঁধিলে গলায়
দশ মুণ্ড ধারণ করে গেলে তুমি লঙ্কাপুরে।
কি বা আছে তোমার ভাগ্যে
কি জানি কোন রাগে পড়ে—
পরের নারী হরণে
নিয়ে এলে তোমার লঙ্কায়।।
তাই নাকি সেই দুই ভাই, হাতে নেয় ধনুর্বাণ,
বনে বনে ভ্রমণ করিল।
রাস্তার মধ্যে হলো দেখা জটায় বলে,—
কে গো সখা,
সম্মুখে তুমি আমার?
রাম বলে, শুন তাত জিজ্ঞাসিলাম পক্ষী
জান নাকি সীতার সন্ধান?
পক্ষী বলে, জানি ভাল, তোমার সীতা হরে নিলে,
লঙ্কেশ্বর রাবণ দস্যু হয়ে।
সম্মুখেতে পড়ে গেল, তায় বাধা দিতে হলো,
বাধা দিতে পেলাম এই শাস্তি।[২৯] —মুর্শিদাবাদ।

দাঁড়া-কবি

কবিগানের পূর্বে পশ্চিম বাংলায় উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক এক শ্রেণীর গান প্রচলিত ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এই সম্পর্কে বলেছেন, "হাফ আখড়াই দাঁড়া সখের কবি। প্রথম 'চিতেন' পরে 'মহড়া' ও সর্বশেষে 'অন্তরা' গাইতে হয়, কিন্তু লিখন কালে অগ্র মহড়া পরে চিতেন, শেষে অন্তরা হইবে।"[৩০]

মহড়া

সখি বলব কি এ দুখিনীর এ জ্বালা বারোমাস।
গেল চিরকাল কাঁদিতে, বসন্ত কি শীতে,
হোয়েছে যেন সীতার বনবাস।
যদি কই, তবেই, সই সর্বনাশ।[৩১]

এই গানের 'মহড়া' অংশে জনমদুখিনী সীতার রোদনভরা জীবনের অন্তর্জালা আত্মপ্রকাশ করেছে।

তর্জাগান

কবি-গানের মতই তর্জাগান এক সময়ে বাংলার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে আনন্দ দান করেছিল। এই আনন্দের উপকরণ আজও শেষ হয়ে যায়নি। তর্জাগান পশ্চিম বাংলার রাজধানী এই শহরকে আজও আকৃষ্ট করে, গ্রাম বাংলার তো কথাই নেই। গ্রামের মানুষ আজও ঝুমুর, বোলান, কৃষাণ-গানের মতই তর্জাগানে আকৃষ্ট হয়। চাপান উতরের মধ্যে যুক্তির লড়াই দেখে আজও সাধারণ-মানুষ আনন্দ পায়, তর্জাগানের তারিফ করে।

সীতার বনবাস, পাষাণ-অহল্যার শাপমোচন ইত্যাদি রামায়ণ কাহিনী এই সব তর্জাগানে ছেয়ে আছে।

চাপান

যা কখনও শুনিনিকো স্পষ্ট হয়েছে ভাই,
পাষাণ মানুষ বল শুনি বা কোথায়?
কোন মানুষের পায়ের ছোঁয়ায় মানুষ হয়েছিল,
সভাকার বন্ধু তুমি প্রশ্নের উত্তর দাও।

উত্তর

পিতৃ সত্য পালনে রাম গেল বনে,
লক্ষ্মণ সীতা সাথে তারা যায় দুজনে।
গৌতম নামেতে মুনি মহাতপকারী,
অহল্যা নামেতে তার ছিল এক নারী।
ইন্দ্র কর্তৃক শরীর তার অপবিত্র হইল,
ক্রোধভরে অভিশাপ তারে মুনি দিল।

পাষাণ হয়ে তুমি থাক ঘোর বনে।
পাপ মুক্তি হবে তোমার রামের চরণে।
রামের চরণ স্পর্শে তার পাপ মুক্ত হল।
এই কারণে বন্ধু, পাষাণ মানুষ হয়ে গেল।[৩২]

—মুর্শিদাবাদ

লক্ষ্মণের চাপান

হনুমান— কে তুমি যোগী জটা ধারী
কোন্ দেশে বসতি।
কেন এলে শিবের বনে
বল না শীঘ্র করি॥

লক্ষ্মণ— সূর্য বংশে জন্ম আমার
নাম ধরি সৌমিত্র।
কেবা তোর মাতা পিতা
বল না শীঘ্র করি।

হনুমান— পবন পুত্র হইয়ে আমি
নাম ধরি মারুতি
কেবা তোর মাতা পিতা
বল না শীঘ্র করি।

লক্ষ্মণ— দশরথ পিতা মম
মাতা যে সুমিত্রা,
পিতামহ অজরাজ
রাম হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

হনুমান— মিথ্যা কেন বল,
ওগো বন জটাধারী,
দশরথের পুত্র কেন
হবে বনচারী।

লক্ষ্মণ— পিতৃসত্য পালন হেতু
শ্রীরাম এলো বনে,
সঙ্গেতে আইলাম মোরা,
জানকী তিন জনে

হনুমান—   কোথাকার রাম তোরা কোথাকার লক্ষ্মণ,
        কেন এলি শিবের বনে বল না এখন।
লক্ষ্মণ—   ক্ষুধায় পীড়িত আছে দেব গদাধর,
        ফলহেতু আইলাম তোমার গোচর।
হনুমান—   পড়েছ আমার হাতে ছেড়ে নাই দিব।
        একটি চড়ে আজি তোরে যমপুরে পাঠাব॥
লক্ষ্মণ—   আররে বনের বানর, এত দর্প তোর।
        লক্ষ্মণের বাণে আজি যাবি যমের দোর॥
হনুমান—   কি ভয় দেখাও আমারে ভণ্ড বনচারী,
        যত বৃক্ষ উপাড়িয়া আজি তোরে মারি।
লক্ষ্মণ—   ত্রৈশিক বাণেতে বিদ্ধ করি খান খান।
হনুমান—   পর্বত চাপান দিয়া মারিব এখন।
        পর্বত চাপান দিয়া লক্ষ্মণে রাখিল।
        চাঁদ বদন সর্বজনে হরি হরি বল॥৩৩

আড়-খেম্‌টা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিগানের মত 'খেমটাগান' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "উত্তর ভারত থেকে আসা যে সব গানের চর্চা কলকাতার আশে পাশে আরম্ভ হয়েছিল, খেম্‌টা তাদের মধ্যে অন্যতম।" খেম্‌টার দুটি বিভাগ আছে—(এক) আড়-খেম্‌টা, (দুই) গড়-খেম্‌টা। খেম্‌টা ও আড়-খেম্‌টা বার-মাত্রার তাল, গড়-খেম্‌টা ছ-মাত্রার। গড়-খেম্‌টা লঘু সঙ্গীত।

আশ্চর্য এই খেম্‌টাগানেও রামকথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(১) উঠরে লক্ষ্মণ পর রে বসন,
সোনার অঙ্গ কেন ধুলাতে শয়ন,
অযোধ্যাতে গিয়ে জিজ্ঞাসিবে মাতা,
তুমি এলে রাম, লক্ষ্মণ রইল কোথা;
কি বলিব লক্ষ্মণের এ কথা
লক্ষ্মণ-শোকে মাতা ত্যজিবে এ জীবন।

অযোধ্যায় হারালাম পিতা
বনেতে হারালাম সীতা,
রণ মাঝে হারাইলাম ভাই লক্ষ্মণ।[৩৪]

—তেহট্ট, নদীয়া।

(২) (ঝুড়ি) ওহে প্রাণপতি করি এ মিনতি
জীবন রামকে বনে দিও না।
জীবন রামকে বনে দিলে,
জীবনে জীবন থাকে না।
জীবন রামকে সঙ্গে লয়ে
খাওয়াইব ভিক্ষা করে
অযোধ্যাপুরে।
ভরতকে রাজত্ব দিয়ে
পুরাও হে মনের বাসনা।[৩৫] —তেহট্ট, নদীয়া।

(৩) (ঝুড়ি) দেখ রাম লক্ষ্মণ যেন কাঁদে না,
লক্ষ্মণ আমার দুধের বালক
বনের মর্ম জানে না,
মা মা বলে কাঁদবে যখন
তুলে দিও সীতার কোলে
সীতাকে মা বলিয়ে পুরাবে মনের বাসনা।[৩৬]

—তেহট্ট, নদীয়া।

গড়-খেমটা

বনে বসি শ্রীরাম শশী পেল সর্বজন,
শেষে রাবণ মারি লঙ্কাপুরী,
হল রাম তাকে নারী বল্লভ ।।
হনুমান স্বভাব ঘুচায়ে, পঞ্চজন লয়ে
শ্রীরাম পদে মনকে বেঁধে
থাকল ভাব লয়ে,
হনুমান চরণে প্রাণ সঁপিয়ে
পেল রাম পদ বল্লভ ।।

গোঁসাই ভুকচাঁদ বলে, ভবার ঘুচিলে,
শঙ্করের গুণনিধি হরি ধন দিলে,
অধিনী তোর এই কপালে,
ঘটবে কি সেই গোঁসাইর ভাব ।।৩৭

—মুর্শিদাবাদ।

কু-কাটার গান

ঐন্দ্রজালিক ছড়ার মত ঐন্দ্রজালিক গানও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায়। কোন অসৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্যে কু-কাটার গান গাওয়া হয়। এ গানেও রামায়ণের ছোঁয়া বিদ্যমান।

ছাঁচ পড়কা পড়শী কাটি
কুকাণে কুজ্ঞান কাটি।
বাপ-বিমার বাপ কাটে,
কে কাটে শ্রীরাম কাটে।
বল বল ভগবান,
শীরামের অভশাপে নাই কুজ্ঞান ।।।৩৮

—বাঁশপাহাড়ী, মেদিনীপুর।

ছৌ-নাচের গান

ছৌ-নাচে নাচই মুখ্য, গান গৌণ। পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিশেষ অনুষ্ঠানে ছৌ-নাচের আসর বসে। নির্জন প্রান্তরে যখন ধামসা বেজে ওঠে, তখন তার গম্ভীর শব্দে বন প্রান্তর কেঁপে উঠে। সেরাইকেলার তদানীন্তন ক্ষুদ্র হিন্দু রাজাদের অনুগ্রহ লাভ করে এই 'ছৌ-নাচ' একদিন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। পুরুলিয়ার আদিবাসী বাঙ্গালী, হিন্দু, অর্ধ-হিন্দুদের মধ্যে 'ছৌ-নাচের' প্রচলন আজও আছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুখোস নাচ অনুষ্ঠিত হয়। এ-নাচে লৌকিক চরিত্র আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ছৌ-নাচের উৎপত্তি সম্পর্কে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—''The origin of the word Chhau seems to be obscure though attempts have been made to derive it from various Sanskrit or indigenous roots. Some believe that it is a corrupt word from the Sanskrit word Chhaya

meaning shadow. But there is nothing of shadow as far as this particular form of dance is concerned. Others believe that the Sanskrit word Chhadma meaning disguise is the source of the word Chhau. This is, however, not philologically acceptable, others are of the opinion that Chhau being a war-dance the word has some or other association with the word Chhami meaning the camp of the soldiers. In that sense Chhaudanee is Chhauni dance or dance held at the camp of the soldiers. But chhau dance is basically a ritual dance which is still ceremonially performed on a particular day of the season.।"[৩৯]

ছৌনাচের কয়েকটি গান নিয়ে উদ্ধৃত হল।

(১) কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা রাণী
চক্র নিবার লাইগ্যা রাজা ডাকে তো আপনি।[৪০]
—বেলপাহাড়ী।

(২) তোমার লাগি দশভুজা, তোমার লাগি জগতে পূজা,
শিবের ধারনা, সীতাকে রাখিলেন গো হরণে।
দয়া কর দেব গণপতি।[৪১]
—বেলপাহাড়ী।

(৩) শুন, সুবদনি, থাকিতে পরানি,
সীতা না দিব রাঘবেরে,
সবিনয় কয় নিকষা তনয় দেহ,
প্রাণ প্রিয়ে, কভু স্থির নয়,
নিশ্চয় মরিতে হবে রে।
মনের বাসনা শুনলো সজনি,
রাঘবের বাণে লটাবে ধরণী,
ভবজ্বালা দূরে যাবে রে।[৪২]
—বেলপাহাড়ী।

(৪) অর্জুন কৃষ্ণ দুইজন এক রথে আরোহণ
উপনীত বনের মাঝেতে।
শুনিয়া ফাল্গুনী কয় শুন কৃষ্ণ দয়াময়
তুমি প্রভু হরি হরি,

তুমি প্রভু মদন-মোহন আর না করিও রণ—
পুন ফিরে যাবো বন।
শুন সখা শ্রীমধুসূদন,
ফিরাও হরি রথের ঘোড়া মুখে দিয়ে টান দড়া
আর না করিব সম্ভাষণ হে।
সুখেতে গান্ধারী মাতা,
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পিতা এখন কান্দিবে
শত বধূগণ হে শুন সখা শ্রীমধুসূদন।[৩]

—বেলপাহাড়ি

(৫) সিঁদুরের বিন্দু মূষিক বাহন,
সব দেবের শক্তি আগে গণেশ চরণ।
বীর করে এস হনুমান বন-নন্দন
শনির দৃষ্টে মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ,
শুন শুন মুনি মূষিক বাহন—
গণেশ দেবের মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ,
আসিছেন বীর হনুমান পবন-নন্দন,
গণেশ দেবের মুণ্ড উড়ে কিসের কারণ।
আসিছেন বীর পবন-নন্দন,
হস্তীর মুণ্ড কেটে হনুমান গণেশে জিয়ায়।[৪] —শালপাহাড়ি

(৬) বাঁকা বাঁকা তেঁতুল বাঁকা, ওরে বাঁকা শ্যাম,
(ওরে) মনের কথা হৃদে গাঁথা বঁধু ওরে শ্যাম।
আচম্বিতে সোনার হিরণ দিও দরশন।
ওরে মাইরো না, মাইরো না হিরণ, রাম-লক্ষ্মণ।
যমুনাকে জলকে যায় কিসের কাঁদনা পায়।
ওগো তোরা বল না গো সঙ্গিনী কে যায়।[৫] —বাঁশপাহাড়ী।

(৭) জনকের সতী আমি, সীতা নাম ধরে;
স্বামী আমার নাম রঘুমণি।[৬] —বাঁশপাহাড়ী

---

১. বাংলার লোকসাহিত্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। পৃঃ ৫১১।
২. চাণ্ডার চন্দ্রভাগ গ্রামের মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।
৪—৬. চকবিহারী, নবীবার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড।

* ভীম-অর্জুন : বাঁশপাহাড়ি সংলগ্ন একটি গ্রাম।

৮. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। ১৯৬২।

৯, ১০ বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
২য় খণ্ড। ১৯৬৬। পৃঃ ১০২৭।

১১-১২ বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড, ১৯৬৭।

১৩ গোপালপুর নদীয়ার নিতাই দাস বৈরাগীর কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৪. তেহট্ট নদীয়া, শ্রীষষ্ঠী মণ্ডলের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

১৫ বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ৪৮২।

১৬ হারামণি ১ম খণ্ড। পৃঃ ৪১।

১৭. প্রবাসী। মাঘ। ১৩৩০। পৃঃ ৪৭০।

১৮ বাউলের ধর্ম। প্রবোধচন্দ্র বাগচী। দৈনিক বসুমতী। ১৩১৮।

১৯-২১ বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য। মণি বর্ধন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ। ১৯৬১।

২২, ২৫ গোপালপুর, নদীয়ার নিতাই দাস বৈরাগীর কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

২৩ বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড। পৃঃ ৮৫৩।

২৪ বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৫২০।

২৮, ২৯, ৩০. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩১. সংবাদ প্রভাকর। ১৬ই অক্টোবর। ১৮৫৪।

৩২, ৩৩ বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড। ১৯৬৬।

৩৪—৩৬. তেহট্ট, নদীয়ার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৩৭, ৩৮. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩৯ Chhau dance of Purulia Dr Asutosh Bhattacharya.
Rabindra Bharati University. July 1972 P 27

৪০—৪৬. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

বালাকি

মুর্শিদাবাদ জেলায় 'বালাকি' নামে এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ বালক-বালিকারা এ-গান গেয়ে থাকে, যদিও 'বালাকি' ছোটদের উপযোগী গান নয়। পৌরাণিক কোন কাহিনীকে কেন্দ্র করে এ-গান রচিত। হয়ত বালাকি বা বালাখি কোন অধুনা লুপ্ত পুরানো গীত পদ্ধতি।

সীতার বন গমন, লবের জন্ম, লক্ষ্মণের শক্তিশেল প্রভৃতি নানা কাহিনী এ গানে শুনতে পাওয়া যায়। লোকসঙ্গীতে রামকথার নব রূপায়ণ এই সব গানে লক্ষ্য করা যায় :

(১) সীতা অতি সতী ছিল, মনস্তাপে বনে গেল
নিদয় হইল প্রভু রাম,
পঞ্চমাসের গর্ভবতী বনে গেল সীতা সতী
মুনির পায়ে হইল প্রণাম।
লব যখন ভূমে বসি মুনি তার নিকটে ছিল,
নাড়ী ছেদন করিলেন বসুমাতা,
লবের দিন পুজিতে চল, ষষ্ঠীপূজা নিত্য হল
পূজা করিলেন নারায়ণ।
লবকে মুনিকে দিয়ে জল আনে যমুনার ঘাটে,
ফেরৎকালে হইল সাক্ষাৎ।
লবকে দেখিতে পায়, কুশকে মারিতে যায়।
সীতা বলে মেরো না গো হবে লবের ভাই,
লবের মত বুদ্ধি ছিল, বাণ শিক্ষা গুণী দিল,
প্রণাম হইল মুনি পায়।
মাগো, সিঁথির সিঁদুর বর্তমান,
লজ্জাতে বাঁচে না প্রাণ।
জন্মে আমরা পিতা দেখি নাই,
থাকতো যদি তোদের পিতা বনে দিত প্রিয় সীতা
এনে দেখাতো তোদের চাঁদ মুখ।
দুই পুত্র কোলে নিয়ে সীতা অভিমানে
নয়নের জলে ভাসে বুকে।
আশীর্বাদ কর তুমি রণেতে যাইব আমি
যাওয়া মাত্র রণে হবে জয়।? —মুর্শিদাবাদ।

(২) শক্তিশেল থেকে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের বৃত্তান্ত নিম্নোক্ত গানে শুনতে পাওয়া যায়।

শুন শুন সর্বজন, আমার একটি নিবেদন,
সর্বদেবের বন্দিলাম চরণ—
রাবণ ছাড়িল বাণ লক্ষ্মণ হলো অজ্ঞান,
ভায়ের শোকে কাতর শ্রীরাম।
প্রাণ রাখিবার কায নয়, ক্ষীরোদ সাগর যায়,
ভায়ের শোকেতে ত্যজিব জীবন।
কেন বা রাম জীবন ছাড় বিশল্যকরণী আন,
তবে বাঁচে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ।
তার কেবা পারে যেতে হনুমান আন ডেকে
যাবে হনু গন্ধর্ব পর্বতে।
হনুকে ডেকে কয়, শুন হনু মহাশয়
বানরগণে রাখে আমার মান।
আজ্ঞা পেয়ে হনুমান, বাহু নাড়া দিয়ে যান,
লম্ফে চলে দুই মাসের পথ।
হনু যখন চলে গেল, রাবণ তা জানতে পেল,
আর কোন বীর নাইক আমার হাতে।
কালনিমিকে ডেকে কয়, শুন, মামা মহাশয়
হনুমানকে বধ কর গো প্রাণে।
পর্বত নিয়ে চলে গেল রামের নিকটে দিল।
আইলেন প্রভু ঔষধ চিনিতে।
সুষেণ নামে বৈদ্য ছিল ঔষধ চিনিয়া নিল
খাওয়াইল লক্ষ্মণকে তখন।
লক্ষ্মণ ঔষধ খেল, কিছু পরে প্রাণ পেল,
শুন শুন যত সর্বজন।
রামলীলা শত শত আরও গাইব কত
বানর গণে দিচ্ছে রামের ধ্বনি,
এই পর্যন্ত এই সব কথা, সাঙ্গ হয়ে গেল হেথা
চাঁদ বদনে শিব দুর্গা বল।[৫] —মুর্শিদাবাদ।

বালিকা সঙ্গীত

সাধারণ অর্থে বালিকারা যে গান গেয়ে থাকে, তাকেই 'বালিকা সঙ্গীত' বলা যেতে পারে। লোকসাহিত্যে বালিকাদের গাওয়া অনেক গানই সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু বিশেষ ভাবে 'বালিকা সঙ্গীত' একমাত্র পশ্চিম সীমান্ত বাংলার বালিকাদের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়।

ছড়ার মত এই গানে রাম-কথা গীত হয়।

রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া বড় বনের কানাতে
লব-কুশ বেঁধেছে ঘোড়া সীতার বলে দে ছেড়ে
রাম কাঁদে বনে ॥
ও রাম, সীতাকে হরণ তরে—
ও রাম, কাঁদে বনে ॥[৩] —বেলপাহাড়ি।

কুষাণ গান

লব-কুশকে কেন্দ্র করে 'কুষাণ' গানের জন্ম। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে লব-কুশের কাহিনী অবলম্বনে 'কুষাণ' গান গীত হয়। মূল গায়েন এ গানে অনুপস্থিত থাকে, পরিবর্তে লব-কুশরূপী দুটি বালক গায়েনের কাজ করে। কোথাও কোথাও কুষাণ গানে সমগ্র রামকাহিনী গীত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় লব কুশের কণ্ঠে বাল্মীকি মুনি যে ভাবে রামায়ণ গান যোজনা করে শ্রীরামচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন, সেই পদ্ধতিতে কুষাণ গান গীত হয়। দলের অধিকারীর হাতে থাকে ব্যানা। ব্যানা বেহালার অভাব মোচন করে। গানের দলে দোহার থাকে। সমস্ত রাত্রি জেগে এ গান গাওয়া হয় বলে কোথাও কোথাও কুষাণ গানকে 'জাগের গান'ও বলা হয়।

বিশ্বামিত্র মুনিবর গাধীর নন্দন।
অযোধ্যা নগরীতে এসে দিলেন দরশন ॥
রাজারে চাহিয়া মুনি লইলেন রাম-লক্ষ্মণ।
সন্দেহ উদিল মনে জিজ্ঞাসে তখন।
কোন পথে যাব বল, মার্গরিথ পর।
বিনা বাধায় সাতদিন লহুতে বিপদ দূর ॥
এতেক শুনিয়া কুমার উত্তরিল তবে
দিনেকে কাম হইলে বিপদকে পড়ে ॥[৪] —কুচবিহার।

পাঁচালি

পা-চালনা করে যে গান গাওয়া হয়, কেউ কেউ সে গানকে পাঁচালি বলেন। কোন কোন গবেষকের মতে, পঞ্চআলি বা সঙ্গীতে মিলে যে গান গাওয়া হয়ে থাকে তাকেই পাঁচালি বলা হয়। আবার অনেকের মতে, পাঁচের সঙ্গে অলীক সাদৃশ্যের জন্যে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়ে পাঁচালি শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

পাঁচালি এই শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীতে বণিক ধর্মী সভ্যতার পাশে এক নতুন সংস্কৃতির রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। দাশরথি রায় উনবিংশ শতাব্দীতে যে পাঁচালি রচনা করেছিলেন, তাতেও পৌরাণিক অনেক কাহিনী স্থান পেয়েছে। প্রাচীন অথবা আধুনিক যে কোনও পাঁচালিতেই দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথা শুনতে পাওয়া যায়। শ্রীরাম-পাঁচালি ও ভারত-পাঁচালি রচিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হল। পৌরাণিক পাঁচালির লিখিত রূপের সঙ্গে এক লৌকিক পাঁচালি প্রকাশ লাভ করল। এই মৌখিক লৌকিক পাঁচালি আজও রচিত হয়ে চলেছে। আজও গীত হচ্ছে গ্রাম-বাংলার নাটমন্দিরে, মেলা-প্রাঙ্গণে। রামকথা, ভারতকথার নব-রূপায়ণ আজও ঘটে চলেছে পল্লী বাংলার হাটে, গঞ্জে, ধনীর গৃহ-প্রাঙ্গণে।

রামায়ণ ও মহাভারতের কথা নিরক্ষর পল্লী বাংলার মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, মৌখিক পাঁচালির মধ্যে তার রূপ আজও প্রত্যক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় যখন পাঁচালি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল, তখন অথবা আরও পূর্ব থেকে বাংলার লোকসাহিত্যে পাঁচালি বাঙালীর সংস্কৃতিকে রসসিক্ত করে বাঙালীর রসের পিপাসা মেটাবার অক্লান্ত চেষ্টা করেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত এমন একজনও বাঙালী খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার সঙ্গে পাঁচালির পরিচয় নেই। পাঁচালি বাঙালীর সাহিত্য ও ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। পাঁচালি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য "পদ ও পাঁচালি লইয়াই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। পাঁচালি বলিতে সাধারণতঃ বুঝাইত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আখ্যায়িক প্রধান ধারাটিকে। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্যসমূহ, আলাওলের পদ্মাবতী এই সবই পাঁচালি, কাহিনী কাব্য। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সন্ধিযুগের পাঁচালি একেবারে স্বতন্ত্র বস্তু। উহাকে বিশিষ্ট করিবার জন্য 'নূতন পদ্ধতির পাঁচালি' বলা যাইতে পারে।"[৫]

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' বাঙালী তার সহই লোকসাহিত্যের মধ্যে বার বার এ-কথা প্রমাণ করেছে। লোকসাহিত্যে রামকথা ও ভারতকথার 'পাঁচালি' অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে।

লৌকিক রামায়ণ পাঁচালি

অরণ্য কাণ্ড

রাম— আমি কার কাছে কই কথা
প্রাণের সীতা হরেছে তাই,
আমার কইতে অশ্রুবারি ঝরে
নয়ন জলে ভেসে যাই।
শোন পশুপক্ষীগণ আমার করো আলাপন—
সীতা আমার নয়নতারা।
জীবনের জীবন কটাক্ষে না দেখতে পেলে,
বক্ষ আমার ফেটে যায়।

জটায়ু— জিজ্ঞাসী তরুলতা তুমি রেখে সীতা,
অন্তরে জ্বলিছে যেমন অনলের চিতা,
মণিহারা ফণী যেমন আঁধারে ঘোরের
কেঁদে জটাই পাখি কয়, শোন রাম দয়াময়।
অস্ত্রাঘাতে জলে যদি জীবন নাহি যায়।
হরণ করে রথ পরে লইয়া গেছে লঙ্কায়।

রাম— মনে ধৈর্য না ধরে আমার সীতার তরে।
সীতার জয় জয় করেছি ভারত মাঝারে
আমার মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ গো,
আমার মন পুড়ে হইল ছাই।

জটায়ু— ওরাম রাম নিবেদন,
মিছে কোরনা রোদন,
যাহা চুরি করে গেছে দুষ্ট রাবণ—
আমি যুদ্ধ দিতে অস্ত্রাঘাতে গো
আমি পড়িয়াছি যে ধরায়।

রাম— স্নেহ বিশেষ কি চরণ করি কি সীতার কারণে
সীতা শুক কল্পতরু জীবনের জীবন,
যেমন ধিকে ধিকে তুষের আগুন গো
হু হু করে জ্বলে যায়।

জটায়ু— বলি দশরথ নন্দন আমি
পেয়েছি বেদন,
ধরো ধরো ধনুক ধর করগো ছেদন,
বলি তোমার বাণে মলে আমি গো
জীবনে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।

রাম— শ্রীরাম ধরে ধনুক বাণ দিলেন ধনুকেতে টান
মহাবীর জটাই পাখির নাশিলেন প্রাণ,
কিসকিন্ধা পুরে প্রবেশ করে—
বানরে করে সহায়।

সুগ্রীব— আমি সুগ্রীব, বানর এলে আমার সমর।
হতে পারি সহায় করি জাতিতে প্রেমের,
দলে দলে যাবে বানর সবে গো,
আমার বানর জাতিগণ সমরে।

রাম— বলি মিতালি তোমার আলিঙ্গন দেহ,
আমার সিংহাসনের অধিকারী করিব।
তোমার বলি রাজা, আমি বধ করিব গো,
আমারে কর সহায়।

সুগ্রীব— বলি দেহ আশীর্বাদ, মনে পুরাইব।
সবে লঙ্কাপুরে গেলে পরে ঘটিবে,
ধীমান সবে কেমন করে সাগর ধারে গো,
পার হয়ে যাবে লঙ্কায়।

রাম— ফিরে আসিবে সকলে লঙ্কায় যায়।
পরে সীতা লাগি অন্তর্বাসী,
বধ না করে আমি আশা পথে থাকবো,
ছেড়ে গো সীতার কারণে ভাই।

সুগ্রীব— সীতা অশোককাননে রেখেছে গোপনে—
নিত্য নতুন জ্বালাতন দেয় চেড়ীগণে
ওরাম লক্ষ্মণ বলে কেঁদে সীতা গো
নয়ন জলে ভেসে যায়।

রাম— মনে মনে কাঁদে রাম, বারি ঝরে অবিরাম,
কেমন করে যাব ফিরে আমি নিজ ধাম,
বিধি এই ছিল কপালে আমার গো,
আমি বলি গো বিধি আমার।
হল গান, পাঁচালি শেষ হল।
সীতার উপদেশ মনের কথা রইল মনে
চরণ রাখিলাম তুলে মাথায়,
শুনে বিজয় গুপ্ত নাম ও চর, সুজন পরে হয়।
অধম রাম—সীতার চরণ বিনে কেঁদে
অবিরাম এ যুগল চরণ
দিও শেষের দিনে গো ভবপার হইয়া যাব।*

* এই পাঁচালি সাধারণতঃ বোলান গানের পরে গীত হয়।

বোলান গান

পশ্চিম বাংলার লোকসাহিত্যে 'বোলান' গান এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ গানের ধারাটিও বাংলার 'নিজস্ব সম্পদ'। 'বোলান গানের' উৎপত্তি যে কত প্রাচীন তা ঠিক বলা সম্ভব নয়। আদিবাসী ও সাঁওতাল সমাজে এ গান বিশেষ ভাবে প্রচলিত। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে 'বোলান-গানের' প্রচলন খুব বেশী। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব পূজাকে কেন্দ্র করে বোলান-গান সাধারণতঃ গাওয়া হয়, এ-পূজা কোথাও কোথাও গাজন-পূজা নামে খ্যাত হয়ে আছে। 'বোলান-গানের' দল আছে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে। এক এক দলে পনের থেকে কুড়ি জন করে লোক থাকে। মুর্শিদাবাদের দলে সাধারণতঃ একটি ঢোলক ও দু-একজোড়া জুড়ি থাকে। কোথাও কোথাও হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হয়। নদীয়ার 'বোলান' দলে ঢোল, সানাই, ফ্লুট, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। দলকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে বিভিন্ন দলে দু-তিন জন পুরুষ স্ত্রী-লোকের পোশাক

পরে। 'ড্রেস'ও ভাড়া করে আনা হয়। নদীয়ায় 'বোলান' দলে পুরুষেরা মাথায় চুড়া বাঁধে, আর পায়ে ঘুঙুর পরে।

'বোলান' গানের বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি দলেই একজন করে ছড়াদার থাকে, তিনি ছড়া লিখে দেন। 'বোলান' দলে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা ছড়া শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলে, ছড়ায় সুর দেওয়া হয়। অনেক দল আছে যারা বোলান-গান বাউলের সুরে গায়। গানের শেষে এক একটা পালা থাকে। মুহুরী সাধারণতঃ দলের অধিকারী হয়। এক একটা দলে ছোটো ভাগ থাকে। তারা গান গেয়ে আসর জমিয়ে তোলে।

নানা পুরাণ কাহিনীকে কেন্দ্র করে বোলান গান রচিত হয়। সীতার বনবাস, লবকুশ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, দাতাকর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি পালা 'বোলান-গানে' গীত হয়।

রামকথার মধ্যে সীতার বনবাস লব-কুশের কাহিনী প্রধান, এ কাহিনী—লৌকিক রামায়ণ। এ রামায়ণে ছড়াদার তাঁর আপন কবিপ্রতিভার বলে নতুন রামায়ণ সৃষ্টি করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ক্ষীণ প্রভাব কোথাওবা লক্ষ্য করা যায় আবার কোথাওবা কৃত্তিবাসী রামায়ণের গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এ-লৌকিক রামায়ণ অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির রচিত এক অনবদ্য সৃষ্টি। এর ভাষা মেঠো, সুর গ্রাম্য, এ-গান-নতুন দ্যোতনায় ভাস্বর।

ভারত-কাহিনীর বেলায় এই একই কথাই বলা চলে,—রাজা হরিশ্চন্দ্র পালা, দাতাকর্ণ পালা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ লোককবির অপূর্ব সৃষ্টি। এ-সৃষ্টিতে আজও বিরাম নেই। নিত্য নতুন নতুন পালা রচিত হচ্ছে। সন্ধ্যার পর মাঠের কাজ শেষ করে, গ্রামের অধিবাসীরা খোলামেলা জায়গায় মুক্ত আকাশের নীচে, কোথাওবা নদীর ধারে বিরাট মেঠো-বালির চড়ে বসে মাথা নেড়ে গান গেয়ে চলেছে। আগামী চৈত্র-সংক্রান্তিতে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে গাইতে হবে, গ্রামের তথা দলের নাম রাখতে হবে, পাশের গ্রামকে দেখিয়ে দিতে হবে, আমাদের নতুন পালা কত ভাল। 'বোলান' গানের দল প্রায় প্রতি মাসেই গ্রামের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে দলকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে।

রামায়ণ ও মহাভারতের খণ্ড কাহিনী এই সব গ্রাম্য মানুষের সৃষ্টির বেলায় নব-রূপে রূপায়িত হয়। গ্রাম বাংলার মানুষ প্রতীক্ষা করে থাকে, কবে চৈত্র-সংক্রান্তি আসবে, দু-তিন দিন ধরে 'বেলান-গান' পরিবেশিত হবে। সীতার দুঃখে তারা কাঁদে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ব্যর্থ জীবনের সকরুণ ইতিহাস যেন তাদের প্রতিদিনের রোদন ভরা বেদনাময় কাহিনীরই প্রতিফলন।

রামকথা ও ভারতকথা যেন গ্রামবাংলার মানুষের অন্তরের ব্যথা ভরা কাহিনী। প্রতিদিনের বিড়ম্বনাময় জীবনের নানা সংঘাত, নানা দুর্বিপাক, গ্রামের মানুষ এই সব পুরাণ কাহিনীর মধ্যে খুঁজে পায়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র পালায় রোহিতাশ্বকে নিয়ে রাণী শৈব্যা শ্মশানে এসেছেন। ঘাটোয়াল কে তিনি কি দেবেন, একটিও কড়ি তাঁর নেই। এ কাহিনী পল্লী-বাংলার মানুষের জীবন্ত কাহিনী। তাইতো মহাকাব্যের এ-কাহিনী আজও লোকসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করে, নতুন সৃষ্টিকে প্রেরণা দেয়। রামায়ণ-মহাভারতের খণ্ড কাহিনী নতুন নতুন লোকসাহিত্য সৃষ্টি করে চলে। 'বোলান-গান' গীত হয় গ্রাম বাংলার মেঠো সুরে।

জারী গান

"জারীগান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় করুণাত্মক গান। জারী গানের মত ব্যথার সুর অন্য কোন গানে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন তীব্রভাবে অন্য কোন পল্লীগানে প্রকাশ করা হয় নাই। মানুষ অবস্থার দাস। চারিদিকে মরু ধু ধু করিতেছে। একবিন্দু বারি পাইবার উপায় নাই। পিপাসার্ত নরনারী বিশেষতঃ শিশুদের অসহ্য এবং অকথ্য যন্ত্রণা দেখিয়া সত্যই আমাদের ইচ্ছা করে—

জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।
হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন
ওরে যেনা পথে গিছিরে দুই ভাই জোবের ভাই এমান হোচেন।
সেই না পথে যাবোরে আমি-করে আমার গোরকাফন
রাম লক্ষণ গেছেরে বনে অযুধ্যা ছেড়ে।
ঐরকম গেছেরে দুই ভাই মদিনা শূন্য করে
ভাই ভাই বলে ডাকছে হানেক আর কি প্রাণের ভাই আছে।
যে বলের বল কলেমরে জয়নাল সে বল ভেঙেছে
যার বলের বল করছ তুমি সে বল কি আর আমার আছে
জহর গুলে আনরে জয়নাল জহর খেয়ে যাই মরে।"[১]

'জারীগান' দলবদ্ধ ভাবে গীত হয়। মুসলমান সমাজে 'জারীগান' হজরত ইমাম হোসেন ও হাসানের নিষ্করুণ হত্যার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। উপরোক্ত সঙ্গীতে রামায়ণের রাম লক্ষণের অযোধ্যা ত্যাগের কাহিনীর সঙ্গে মুসলমানদের মহরম উৎসবের বেদনাময় কাহিনীকে তুলনামূলক ভাবে দেখান হয়েছে।

বাংলার দুই মহাকাব্য—রামায়ণ-মহাভারত শুধুমাত্র হিন্দু সমাজকেই নয়, মুসলমান সমাজকেও প্রভাবিত করেছে। এ-দুই মহাকাব্যের কাহিনী লোককবির অন্তরকে স্পর্শ করেছে। বাঙালীর অন্তরাত্মার সঙ্গে এ দুই মহাকাব্য একাত্ম হয়ে আছে, তাইত বাংলা দেশের 'জারীগানে' পাই বাঙালীর মহাকাব্যের প্রধান দুটি চরিত্রের উল্লেখ।

ঝুমুর

পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে 'ঝুমুর' গানের বহুল প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এ গান সুদূর অতীতকাল থেকে লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে আছে। সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ তাদের উৎসব অনুষ্ঠানে 'ঝুমুর গান' গেয়ে থাকে। উত্তরে সাঁওতাল-পরগণা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণের সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চলে 'ঝুমুর গান' শুনতে পাওয় যায়। মুণ্ডা জাতির মধ্যেও এ গান বিশেষ ভাবে প্রচলিত। আদিবাসী সাঁওতালরা প্রকৃতপক্ষে দোভাষী জাতি। এই সব দোভাষী জাতি বাংলা ভাষার গান গায়। উৎসব অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে, বাংলা লোক-সাহিত্যকে পুষ্ট করে তোলে। সহজ ভাষায় সরল সুরে 'ঝুমুর' গান পরিবেশন করে নিজেদের অবসর বিনোদনের ক্ষণটিকে মধুর করে তোলে। দোভাষী জাতি বাংলাকে আপন সংস্কৃতির অঙ্গ করে নিয়ে লোকসঙ্গীত রচনা করে। রাম-কথা ভারত-কথায় কয়েকটি চরিত্রের নামকে সম্বল করে নিজের জীবনের ছোটখাট ঘটনাকে গানের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করে নিজেদের জীবনকে মধুময় করে তোলে। রামকথা ও ভারতকথায় রচিত 'ঝুমুর' গানের মাধ্যমে 'আখড়া' উৎসব মুখর হয়ে উঠে।

"প্রত্যেক আদিবাসী পল্লীতেই নৃত্যগীতের একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে,' তাহাকে উপরোক্ত অঞ্চলের প্রায় সকল আদিবাসীই আখড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। শব্দটি স্বতন্ত্র অর্থে বাংলাতেও প্রচলিত আছে। পল্লীর যুবক-যুবতীগণ আখড়ায় সমবেত হইয়া নৃত্যগীতের উদ্যোগ করে, তখন সর্বপ্রথম বন্দনা-গান গাহিয়া থাকে—

আখড়া বন্দিয়া গুরু, ভালো গীত গাই।
গুরু রাম লক্ষ্মণ সাদরে বাজাই।
সীতামণি ঝুমুর খেলাই।"[৮]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আমরা 'ঝুমুর' জাতীয় রচনার সন্ধান পাই। সুতরাং 'ঝুমুর গান' যে কোন অতীত কাল থেকে বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, তা আজ তার বলা সম্ভব নয়। 'ঝুমুর' সাধারণতঃ কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করেই রচিত ও গীত হয়ে থাকে। রামকথাকে কেন্দ্র করেও 'ঝুমুর' গান রচিত হয়। রামায়ণের প্রভাব যে আদিবাসী সমাজের মধ্যেও কত গভীরে প্রবেশ লাভ করেছে, তা 'ঝুমুর' গানের মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ প্রেম গানে যে সব অনুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়, 'রাম লীলা ঝুমুরে' তার পূর্ণতা পাওয়া যায়। রামকথা প্রসঙ্গে যে সমস্ত 'ঝুমুর' গান গাওয়া হয়, তার মধ্যে পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। 'রামলীলা ঝুমুর' বর্ণনামূলক। এ-গানে 'সীতা হরণে রামের বেদনা শক্তিশেলে লক্ষ্মণের পতন ও ভ্রাতা রামের বিলাপ, সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র' প্রভৃতি কাহিনী স্থান লাভ করে। রামচন্দ্র 'বিষ্ণুর ঐশ্বর্য রূপের অবতার'...সুতরাং 'রামলীলা ঝুমুরে' শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ বৃত্তান্তও প্রাধান্য লাভ করেছে।

'ঝুমুরের' বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। 'ঝুমুর'কে আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। আদিবাসী সাঁওতালদের বাংলা 'ঝুমুর' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শেষ পদে সাধারণতঃ মিল নেই। এই মিল না থাকাটাই আদিবাসীদের লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মেদিনীপুর, নদীয়ার 'ঝুমুরে' শেষ পদে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'ঝুমুর' পাঁচালির আকারেও গীত হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও 'ঝুমুর' বেশ দীর্ঘ।

আদিবাসীর 'ঝুমুরে' শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী আর কদম গাছ (করম) খুবই প্রিয়। করম গাছকে কেন্দ্র করে—'ঝুমুরের' মত কোথাও কোথাও 'করম সঙ্গীত'ও গীত হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 'ঝুমুরে' ভাব সুগভীর। কিন্তু রামায়ণ-বিষয়ক 'ঝুমুরে' ভাবের পরিবর্তে বর্ণনাই প্রধান। ব্যক্তিজীবনের নানা ব্যথা-বেদনা এই সব গানের মধ্যে স্থান লাভ করেছে।

রামায়ণ বিষয়ক 'ঝুমুর'কে সাধারণতঃ 'রাম-লীলা ঝুমুর' বলা হয়।

ঝুমুর : লক্ষ্মণ-শক্তিশেলের গান

শক্তিশেলে যবে পড়িল লক্ষ্মণ,
কান্দে শ্রীরাম রাজীব লোচন
ভাসেন নয়নাসারে।

হায়রে লক্ষ্মণ। কেন এ শয়ন
মধ্যারণ্য পাথারে রে।
॥ ধুং ॥ উঠ উঠ বীরঃবর ধনুর্দ্ধর
দশশির বধিবারে ॥
আজি কি হে লঙ্কাপতি-বিনাশিলি,
রিপুরক্তে কুল কালিমা ধুইলি,
উদ্ধারিলি কি সীতারে।
তেই ধরপারে, ঘুমাইলি কি রে,
কুল শ্রম জুড়াবারে রে ॥ ধুং।
রঘুকুলপণ আজি বৃথা যায়,
বিভীষণ রাজা না হইল লঙ্কায়
হায়রে, ধিক্ আমারে।
ভবপ্রীতা ভণে শ্রীরাম শরণে
শমন এড়াতে পারে রে। ধুং।

রামচন্দ্রের বনগমনে ভরতের বিলাপ

ভরত কহেন হরি। কুল প্রথা ভঙ্গ করি
কেমনে ধরিব এ জীবন?
জ্যেষ্ঠেরে রাখিয়া বনে কনিষ্ঠ হয়ে কেমনে
সিংহাসনে বসিব এখন ॥
॥ ধুং ॥ শুভ কমল লোচন
করুণা সাগর প্রভু ভূষিত ভূষণ ॥
যদি না যাবে নিতান্ত, শুন তবে হে শ্রীকৃষ্ণ
দাসের একান্ত নিবেদন।
পাদুকা দেহ আমারে রাখি সিংহাসন পরে
করে ছত্র করিও ধারণ ॥ ধুং ॥
রাজকর্তব্য সাধিব রাজভোগ না স্পর্শিব
আজ্ঞা তব করিব পালন।
সেবিব তব নগর, সেবে তব রঘুবর
মধুকর চম্পক কানন ॥ ধুং ॥

চতুর্দশ বর্ষ ধরি এমনি থাকিব হরি।
আশা করি তব আগমন।
আশা অন্তে রঘুপতি মরিব নিশ্চয় অতি—
তব ক্রীতরে গতি চরণে ।। ধু ।।[১০]

১-৪. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৫. দাশরথি রায়ের পাঁচালি। ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬২। পৃঃ ৮

৬. কুচবিহার, মরীচ্যার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৭. হারামণি (২য় খণ্ড) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন। বাংলা একাডেমী। ঢাকা। পৃঃ ৪১।

৮. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রথম খণ্ড (আলোচনা)। ১৯৬২। পৃঃ ২৫৩।

৯-১০. কুসুম সঙ্গীত। মনোহর ধীবর প্রণীত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধাঁধা

ধাঁধা সাধারণতঃ রূপকে মোড়া। মনের একটা ভাবকে একটা ছড়া বা কৈয়ালির মধ্য দিয়ে ধাঁধায় প্রকাশ করা হয়। ধাঁধা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয়। এ মতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা চলে। ধাঁধা এমনই একটা বিষয়, যা শুধু অপরিণত শিশুরা কেন, পরিণত বুদ্ধির মানুষও এর জবাব খুঁজে পান না। আমরা জানি সংহত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই লোকসাহিত্যের জন্ম। যে জাতি অন্য জাতির সংস্কৃতিকে আপন করে গ্রহণ করতে শেখেনি, সে জাতির সংস্কৃতিতে লোকসাহিত্যের উদ্ভবও ঘটেনি। ধাঁধা বুদ্ধির অনুশীলন বা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য নয়, মনে হয় হাস্যরস সৃষ্টিই এর প্রধানতম উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজের অতি সাধারণ কোন বস্তুকে অবলম্বন করেই সাধারণতঃ ধাঁধার সৃষ্টি।

ধাঁধার বৈশিষ্ট্য হল, চিন্তা করে, গবেষণা করে এর জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনশ্রুতির মধ্য দিয়ে যা প্রচলিত, সেই সঠিক উত্তরটাই ধাঁধার প্রশ্নকারক আশা করে। এমনকি যদি চিন্তা করেও একটা উত্তর খাড়া করা যায়, তা সঠিক বলে গণ্য হবে না।

অপরিচিত কোন বস্তুকে অবলম্বন করে ধাঁধা রচিত হয় না। বহু পুরাতন কালে যে ধাঁধা রচিত হয়েছিল, সেই ধাঁধা আজও সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। কারন 'বাইরের দিক দিয়ে আমাদের সমাজে যতই পরিবর্তন হোক না কেন, অন্তরের দিক দিয়ে আমাদের সমাজ জীবন অপরিবর্তিত।' ধাঁধার মধ্যে এক প্রকারের চিরন্তনী ধারা লক্ষ্য করা যায়। আদিম সমাজে যে ধাঁধার জন্ম হয়েছিল, আজও লোকসমাজে সে ধাঁধা প্রচলিত।

একই অঞ্চলের প্রচলিত দুটি সমাজের ধাঁধার মধ্যে আবার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধাঁধার কোন বাঁধাধরা পদ্ধতি নেই। ধাঁধা গদ্যে, অমিত্রাক্ষরে বা মিত্রাক্ষর পদ্যেও রচিত হতে পারে। আমাদের দেশে যে সমস্ত লৌকিক ধাঁধা প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে ছড়ার সম্পর্ক খুবই গভীর। ছড়ার মধ্যে যেমন একটা সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায়, ধাঁধাও তেমনই সাবলীল। পার্থক্যের মধ্যে ছড়া দীর্ঘ আর অসংলগ্ন, কিন্তু ধাঁধা ছোট আকারের, ধাঁধার মধ্যে চিত্রধর্মিতাও লক্ষ্য করা যায়। এই চিত্রধর্মিতা শুধু আমাদের দেশ নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ধাঁধায় এই চিত্রধর্মিতা চোখে পড়ে।

বহু প্রাচীনকাল হতেই ধাঁধার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় প্রাচীনতম সাহিত্যে (ঋক্ বেদ) ধাঁধার উল্লেখ আছে। "বৈদিক ও ইহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগের যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব বধ করিবার পূর্বে হোতৃ ও ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে আর কেহ অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্রই এই ধাঁধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মহাভারতের মধ্যে বকরূপী ধর্ম পঞ্চপাণ্ডবকে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই পরিচিত। সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগরে'র মধ্যে এক রাজকন্যা যে কি ভাবে বিনীত মতি নামক এক রাজার জিজ্ঞাসিত ধাঁধার উত্তর দিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার কথা উল্লিখিত আছে।"[১]

"মহাভারতের বকরূপী ধর্মের পঞ্চপাণ্ডবকে যে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার কথা আছে, প্রাচীন গ্রীকসাহিত্যেও প্রায় অনুরূপ কাহিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ছদ্মবেশিনী রাক্ষসী স্ফিংক্স পথিপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পথিককে দুরূহ ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিত। পথিক উত্তর দিতে পারিত না, অবশেষে রাক্ষসী তাহাকে বিনাশ করিত। অবশেষে এডিপাস সেই ধাঁধার উত্তর দিয়া রাক্ষসীর কবল হইতে রাজ্য পরিত্রাণ করিলেন। দুরূহ ধাঁধার মীমাংসা করিয়া দিয়া রাজকন্যা সহ অর্ধেক রাজত্ব লাভের কাহিনী ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যেও বিরল নহে। এই বিষয়টি ভারতীয় সাহিত্য হইতে ইউরোপ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর কোন কোন আদিম জাতির বাৎসরিক কোন কোন অনুষ্ঠানে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সেই জন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন—ধাঁধা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন।"[২]

বাংলা লোকসাহিত্যে রামকথা ও ভারতকথার প্রভাব যে কত সুদূর পরিব্যাপ্ত, তা লোকসাহিত্যের অঙ্গ ধাঁধার আলোচনাতেও স্পষ্টতর হবে।

প্রথমে রামকথার নামতত্ত্বেও ধাঁধা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা কয়েকটি ধাঁধার উল্লেখেই প্রমাণিত হবে।

নিম্নের ধাঁধাগুলির উত্তর : রামচন্দ্র

(ক) পশু নয়, পশু সাথী করেন ভ্রমণ
কখনওবা যোগী বেশ, কখনো রাজন॥[৩]

—হাতীবাড়ী॥

(খ) পদ্ম নয়, পদ্ম সনে করে ভ্রমণ।
কখনো যোগীর বেশ, কখনো রাজন ॥
অসম্ভব কার্য তার শুনে হাসি পায়।
পিতার কন্যার গর্ভে সন্তান জন্মায়।[৪] —পুরুলিয়া।

(গ) সূর্য বংশে জন্ম তার
অজ রাজার নাতি।
রাবণের বৈরী নয়,
সীতাদেবীর পতি ॥[৫] —হাতীবাড়ী।

উত্তর : সীতাদেবী

(ক) বাপ জন্ম দিলা কিন্তু মা ছিল না কাছে।
ভূমিতে উৎপন্ন বটে নাহি ফলে গাছে ॥
অসম্ভব কথা যদি মানহ সকলে।
এই কথা মিথ্যা নয়, মাটিতে নারী মিলে ॥[৬]

(খ) কি করতে কি হল বিধির গড়া
বিনা বাপে হল ছেলা
ছেলা হইল কখন ?
যখন ছিল না ছেলের মা।[৭] —পুরুলিয়া।

দাঁত শরীরের অঙ্গ। এর সংখ্যা নিরূপণ করাই এ-ধাঁধাগুলির উদ্দেশ্য। রামকথার প্রভাব এ-ধাঁধাতে লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর : দাঁত

(ক) এতটুকু বিলে বত্রিশটা হাড়,
কি ধান বুনত রাজা
রাম-সীতা শাল ?[৮] —হাতীবাড়ী।

(খ) একুড় বাকুর—
কড়ায় চার চার আম।
কুড়ি কড়ায় কুড়িটা ফল
বলে গেছে রাম।[৯] —বেলপাহাড়ী।

উত্তর : বাল্মীকি

মুখেতে বলিতে রাম আর উচ্চারিল।
কত শত প্রাণী বধ হস্তেতে করিল।
কোশলের গুরুর কৃপায় পরম তপস্বী,
হইল খ্যাত ত্রিভুবন।
পূর্বে তার মাতা পিতা
যে নাম রাখিল।
সে নাম পাইয়া লোপ
কি নাম হইল?[১০] —বাঁশপাহাড়ী।

উত্তর : ষাঁড় (ষণ্ড)

অজস্র ভোগী ন রাজা ন-যোগী
মহা বলশালী ন চ ভীমচন্দ্র
শূলী চক্রী, ন শিব, ন বিষ্ণু,
সীতা বিয়োগী, ন চ রামচন্দ্র।[১১] —মৃগ কল্যাণ, হাওড়া।

(ষণ্ডের গায়ে চক্র ও ত্রিশূলের চাপ থাকে। সে ভোগী। হাল টানে। হালের ফলার স্পর্শে সীতার জন্ম। ষণ্ড সীতা হারা রামচন্দ্র নয়।)

উত্তর : রাবণ, বিষ্ণু, কর্ণ

তিন জিভ, তেইশ কান।
এই কথার অর্থ জান।[১২] —মাঠা, পুরুলিয়া।

উত্তর : রাবণ, মক্ষী ও শামুক

বানালাম সাজালাম পান
তিনটি জীবের তেইশটি কান,
যে ভাঙাবে কথার মান,
সেই খাবে বাটার পান ॥[১৩] —বেলপাহাড়ী।

উত্তর : রাবণ ও মন্দোদরী

(ক) ঘরের কুড়ি বাটার পান,
স্ত্রী-পুরুষের বাইশ কান।
এ বাটার পান খাবে যে,
এ-কথার উত্তর দেবে সে।[১৪] —বাঁশপাহাড়ী।

(খ) চুন খয়ের বাটা পান
স্ত্রী পুরুষের বাইশটা কান ।।[১৪] —বেলপাহাড়ী

(গ) দুই স্ত্রী পুরুষে খায় পান,
দুই স্ত্রী পুরুষের বাইশ কান ।[১৬] —২৪পরগণা ।

(ঘ) রামায়ণে লেখা আছে অতি পুরাতন ।
স্বামী স্ত্রী দুইজনে বাইশ হাত কান ।।[১৭] —হাতীবাড়ী ।

উত্তর : লব-কুশ

জন্ম দিল না জন্মদাতা
জন্ম দিল পরে
যখন তাহার জন্ম হল
মা ছিল না ঘরে ।[১৮] —বরিশাল ।

কুশের গানে প্রশ্ন উঠে, ধাঁধার আকারে ।

উত্তর : কুশের জন্ম বৃত্তান্ত

বাপে জন্ম দেয় নাই, জন্ম দিয়াছে পরে,
যখন ছেলের জন্ম হইল, মা ছিল না ঘরে ।।[১৯]
—কুলবাড়ী ।

---

১. The Ocean of Story. N. M. Panzer. Vol. VI. 1926

২. বাংলার লোকসাহিত্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । ১ম খণ্ড । ১৯৬২ । পৃঃ ৫১৮ ।

৩—১০. বাংলার লোকসাহিত্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । ৫ম খণ্ড । ১৯৭১ ।

১১. পূর্বকল্যাণ, চাকতার ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষালের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত ।

১২—১৮. বাংলার লোকসাহিত্য । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য । ৫ম খণ্ড । ১৯৭১ ।

১৯. বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য । মণি বর্ধন ।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ । ১৯৬১ । পৃঃ ৫৮ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রবাদ

লোকসাহিত্য পল্লী বাংলার শাশ্বত জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম। লোকসাহিত্যের আর একটি আদিম শাখা হল প্রবাদ। প্রবাদ মানব জীবনের দূরদর্শন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। প্রবাদ হল: "An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a figure, periphroses, antithesis or hyperbole."[১]

প্রবাদ ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। প্রাচীনকালের প্রচলিত একটা প্রবাদ সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের খোলস পালটে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়। হাজার বছর আগে রচিত যে চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বলে গ্রহণ করা হয়, সেই ধর্মীয় সাহিত্যে যে প্রবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু আজও বাংলা ভাষায় প্রচলিত। এই সব প্রবাদের মধ্যে দিয়ে তখনকার সমাজের প্রতিফলন যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি চর্যাপদের বিভিন্ন শ্লোকগুলি যে বাংলা ভাষায়, বাংলার জল-হাওয়ায় রচিত তাও প্রমাণিত হয়।

মানব চরিত্রের অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবাদের যে যোগ আছে, তা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত প্রবাদগুলি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা আর সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে যে প্রবাদের সম্পর্ক গভীর, তা অন্য দেশের প্রচলিত প্রবাদের সঙ্গে পরিচিত হলেই উপলব্ধি করা যায়। বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ 'কাল গরুর দুধ ভাল'র সঙ্গে ইংরাজী প্রবাদে 'লাল গরুর দুধ ভাল'র সম্পর্ক নিবিড়। কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

অনেকের মতে বক্রোক্তি ও রূপকই প্রবাদের প্রধান অবলম্বন।

প্রবাদে অনেক সময়ে মনের ক্ষোভকে একটা রূপকের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। অনেক দিনের বিক্ষোভ একটা সাধারণ প্রবাদের মধ্যে প্রকাশ করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যঙ্গের দ্বারা জর্জরিত করা হয়। একটা সাধারণ প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও এই বক্রোক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রবাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের নানা দোষ-ত্রুটির উপর তীব্র কটাক্ষপাত করা হয়। প্রবাদকে Wit-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। আমাদের সামাজিক আচরণের মধ্যে যে সব ভুলত্রুটি ধরা পড়ে, প্রবাদ তারই

সুকঠোর সমালোচক। আমরা যদি প্রবাদগুলি সংগ্রহ করে একটা সমাজের সামাজিক আচার-আচরণ, আর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বসি, ভুল করা হবে। শুধুমাত্র প্রবাদের মধ্যে দিয়ে একটা জাতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ আর নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে প্রবাদের প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রবাদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বৈপরীত্য নির্দেশ করাও প্রবাদের একটি ধর্ম।

প্রবাদের প্রধান ধর্ম অনুপ্রাস।

মিত্রাক্ষরে রচিত প্রবাদের প্রচলন এদেশে সুপ্রচুর। পুনরুক্তি প্রবাদের অপর ধর্ম।

একদিন চর্যাপদে যে শ্লোক উচ্চারিত হয়েছিল, তার অনেক অংশই আজ প্রবাদে রূপান্তরিত।

কৃত্তিবাস যে শ্রীরাম-পাঁচালি রচনা করেছিলেন, সেই মহাকাব্যের অনেক শ্লোক, বাক্যাংশ আজ প্রবাদে পরিণত, অথবা কৃত্তিবাস বাংলায় প্রচলিত কিছু কিছু প্রবাদ তাঁর শ্রীরাম-পাঁচালিতে গ্রহণ করেছিলেন।

"রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র বাঙ্গালী সমাজের কাছে ছিল অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র। রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনা তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা প্রবাদে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে সেই সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, পৌরাণিক চরিত্রগুলি রূপক নিরপেক্ষ চরিত্র রূপে প্রবাদে স্থান পায়নি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা সমস্যা, পরিচিত চরিত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিকেই পৌরাণিক চরিত্র কিংবা ঘটনায় রূপকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।"[২]

'রাম না জন্মাতেই রামায়ণ'-এ প্রবাদ অনাগত কোন কাল্পনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়।

রামকথা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। মহাকাব্যের প্রভাব আজ লোকসাহিত্যের সমস্ত বিভাগে পরিব্যাপ্ত।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু শ্লোক, ঘটনা আজ যেমন প্রবাদে রূপান্তরিত, তেমনি নানা বক্রোক্তি ও রূপক রামকথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

মানুষ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসলকে রামকথার বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে এ-সকল প্রবাদ আজও গ্রামবাংলায় প্রচলিত।

আজ মরে লক্ষ্মণ, ওষুধ দেবে কখন?

(ওষুধ ছ-মাসের পথ)

ভাবার্থ : রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ আহত। রামচন্দ্র ভ্রাতার জীবনহানির আশঙ্কায় চিন্তায় নিমগ্ন। কি উপায়ে লক্ষ্মণকে বাঁচান যায়। সুষেণ এসে ঔষধ প্রয়োগ করার পরামর্শ দিলেন। গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধ পাওয়া যাবে। ভোর হওয়ার আগেই ঔষধ প্রয়োগ করতে না পারলে লক্ষ্মণকে বাঁচান যাবে না। 'পথ আঠার বছর'। এত দূর থেকে ঔষধ আনা অসম্ভব। শ্রীরামের চিন্তা আরও বেড়ে যায়।

মূল ভাবার্থ : প্রতিকারের সহজ উপায় নেই।

(২) "এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥"

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

ভাবার্থ : রাবণকে লক্ষ্য করে এ উক্তি উচ্চারিত হয়েছে। সীতাকে হরণ করে রাবণ পাপে ডুবে আছে।

মূল ভাবার্থ : পাপের ফলে বংশ লোপ হয়।

(৩) 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর'।

ভাবার্থ : রামচন্দ্র স্বয়ং অসাধারণ বীর। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে সুগ্রীব যখন বানর সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন, অসংখ্য বানর সৈন্য সঙ্গে পেয়ে রামের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। রামচন্দ্র এত শক্তিশালী হয়ে উঠলেন যে, রাবণের যুদ্ধজয়ের আর কোন আশা রইল না।

মূল ভাবার্থ : দুইজন শক্তিমান ব্যক্তি একত্রিত হলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়।

(৪) এগোলে রাম, পেছোলে রাবণ।

ভাবার্থ : স্বর্ণ মৃগের রূপ ধারণ করে মারীচ সীতাদেবীকে প্রলুব্ধ করল। রামচন্দ্র বাধ্য হয়ে স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। রাবণের প্ররোচনায় মারীচকে স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করতে হয়েছিল, কিন্তু মায়াবী মারীচকে সংকটজনক অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। সম্মুখে রাম, আর পশ্চাতে রাবণ।

মূল ভাবার্থ : উভয় সংকট অবস্থা।

(৫) কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

ভাবার্থ : লঙ্কার অধিপতি রাবণের মাতুল কালনেমি। লক্ষ্মণ যখন অসুস্থ,

রাবণ তখন কালনেমিকে লঙ্কার অর্দ্ধেক দেওয়ায় অঙ্গীকার করেন। লঙ্কার কোন অংশ কালনেমির ভাগে পড়বে সেই চিন্তায় কালনেমি বিভোর। রামচন্দ্রের কাছে রাবণের পরাজয় সুনিশ্চিত, সুতরাং লঙ্কা ভাগের প্রশ্নই উঠে না।

মূল ভাবার্থ: অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ লাভের আশায় অত্যধিক অগ্রবান হওয়া।

(৬) রাবণের গুষ্টি।

ভাবার্থ: রাবণের ছিল এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি।

মূল ভাবার্থ: অনেকগুলি পুত্র-কন্যার সংসার।

(৭) রাবণের চিতা।

ভাবার্থ: রামচন্দ্রের হাতে রাবণকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

মূল ভাবার্থ: কোন অপ্রীতিকর ঘটনা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকা।

(৮) রাবণের দোষে হয় সমুদ্র বন্ধন।

ভাবার্থ: রাবণের সীতা হরণের হেতু রামচন্দ্র সাগর বন্ধন করেছিলেন সীতা উদ্ধারের জন্যে।

মূল ভাবার্থ: একের অপরাধে অপরের দণ্ড ভোগ।

(৯) রাবণের সিঁড়ি। (স্বর্গের সিঁড়ি)

মূল ভাবার্থ: মহৎ সংকল্পের ব্যর্থতা।

(১০) রাম: । রামচন্দ্র। রাম বলো। রাম রাম।

ভাবার্থ: তাচ্ছিল্যভরে কোন কথা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান।

(১১) রাম কামারের ধন
রাম কামারেই শেষ।

ভাবার্থ: জীবিত কালেই সর্বস্বান্ত।

(১২) রাম খাই, কি রাবণ খাই।

ভাবার্থ: প্রচণ্ড ক্ষুধা।

(১৩) রাম না হতে রামায়ণ।

ভাবার্থ: কথিত আছে, রাম জন্মাবার পূর্বেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

(১৪) অতিদর্পে হতালঙ্কা ;

ভাবার্থ : রাবণের দর্পে লঙ্কার পতন, রাবণের ধ্বংস।

মূল ভাবার্থ : দর্পের পতন অনিবার্য।

---

১. Hazlitt, W. C. : A Dictionary of American Proverbs and Proverbial Phrases.

২. বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র। ড: বরুণকুমার চক্রবর্তী পৃঃ ৫০।

১—১৪. প্রবাদ সংকলন। সংগ্রাহক লেখক।

ছড়া

আলকাপের ছড়া

ভাল কথা আছে গাথা ঐ রামায়ণে।
অযোধ্যাতে রামের বাস জানে সর্বজনে ॥
শিকার কারণ রাম-লক্ষ্মণ গিয়েছিল বনে ;
মৃগ মারিবার তরে রাম গেল বন মাঝারে,
সেখানে দেখেছে ঘোড়ার গাড়ী, কত চলেছে সারি সারি।
রাম তখন অবাক হয়ে লক্ষ্মণকে তা জিজ্ঞাসিলে,
লক্ষ্মণ বলে ওগো দাদা, এখানে তো জনক রাজা
জানকের আছে একটি বেটি তাহার রূপে পরিপাটি।
পাহাড় ও পর্বত আকার করে রেখেছে ধনুক তৈয়ার।
ধনুকের ছিলে যে জন দিবে তাহার সঙ্গে বিয়ে হবে।
কথা শুনে রাম-লক্ষ্মণ মিথিলায় করিল গমন,
মিথিলাতে গিয়ে রামের হল বিয়ে।
হাতে হাতে ঐ সীতাকে সঁপে দিল রামের হাতে,
রাম বেড়ায় দেশ-বিদেশে লক্ষ্মণ থাকে সীতার কাছে।
ও সীতা কেমনে হরিল রাবণ, লঙ্কায় লয়ে গেল ॥[১]

—নদীয়া।

এই আলকাপ ছড়াটিতে রামায়ণের লৌকিক রূপান্তর স্পষ্টতর হয়েছে।

নিম্নোদ্ধৃত আলকাপ ছড়াটিতে রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্রটি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কৈকেয়ী রামায়ণের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। রামায়ণের ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে কৈকেয়ী এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণা।

তুমি মায়ের কথা শুনে গেলে বনে, জীবনের জীবন,
কাঁদে-মা-জননী পাগলিনী ধরা অচেতন।
নিশি প্রভাত কালে হবেন রাজা রাম গুণমণি,
এই কথা জানতে পেল কৈকেয়ী রাণী।
ওহে রাজা, বসে শুন করি আমি নিবেদন,
ভরত রাজ্যের রাজা হবে, রাম বনবাসে যাবে,
চৌদ্দ বৎসর কারণে রামচন্দ্রকে পাঠাও বনে।

এ-কথা শুনে রাজা ভূমিতে পড়িল,
কৈকেয়ীর কথাগুলো শেল সম বিঁধিল।
ক্ষণ পরে চেতন হয়, কৈকেয়ীকে ডেকে কয়,
আবার অচেতন হল রামচন্দ্র জানতে পেল,
পিতা মায়ের নিকটে আজ পড়েছে সংকটে।
দুই হস্ত ধরে তোলে, পিতাকে বুঝায়ে বলে,
বাবা কোন দুঃখ নাই, বনে যাইব নিশ্চয়।
কেঁদে বলে মা জননী, কোথা যাবে যাদুমণি,
বহু তপস্যার ফল তোমায় পেয়েছিলাম কোলে।
মনের দুঃখ থাকলে মনে পাগল করে যাব বনে,
বাবা জনমের মত একবার দেখি চাঁদবদন।
হয়ে বিধি একি ছল, মোর কপালে এই কি ছিল,
মায়ের দুই হস্ত ধরে রাম বুঝাল ধীরে ধীরে,
থাকগে মা ধৈর্য ধরে আসব চৌদ্দ বৎসর পরে,
পিতার আজ্ঞা পালনে আমার যেতে হল বনে।* —নদীয়া

সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রেও রামকথা-ভারতকথা বাদ পড়েনি। বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে লৌকিক রাম-লক্ষ্মণ ওঝার বিষ ঝাড়ার মন্ত্রে স্থান লাভ করেছে। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে, তার প্রাত্যহিক সুখদুঃখের সঙ্গে রামকথা জড়িত। এখানে এক ভিন্ন পরিবেশে রাম-লক্ষ্মণের কথা উল্লিখিত হয়েছে, মূল রামায়ণ-মহাভারত এখানে অনুপস্থিত।

ইন্দ্রজালিক ছড়া : সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

উঠ উঠ আরে ডেউকা কত নিদ্রা যাও।
আসিতেছে গড়ুর জাতি চক্ষু মেলিয়া চাও॥
এই কথা শুনিয়া পদ্মা মনে করল রিশ।
বচনেতে খাইয়া যায় কালকূট বিষ॥
সাতাশ সমুদ্রে ডেউকা ভাসে।
আরে দেইখ্যা গড়ুর জাতি খল খলাইয়া হাসে।
রামে বলে লক্ষ্মণ ভাই।

ভেউকা জিয়াইয়া দিলে ঘর বাই ॥
এই বেশ আক্সাইবয়া রাত্রি, গেছিল কই
গেছিলাম বাপু উত্তর দেশ।
বিদ্যুৎ বায়ে নানান বেশ।
বাওড়ুহে ওয়াও চৌচির।
ভাংগুক খিলি নামুক বিষ ॥
উলুখেতে থাপ্ পর।
পুরুষ বরূণ বাওকর ॥
আরে বিষ গামলাতে যাও।
চল বিষ চল গামলাতে চল ॥[৩০]

কবির ছড়া

কবিয়ালদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পঙ্গপালের তুলনা করেছেন। পঙ্গপাল যেমন হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যায়, কবিয়ালরাও উনবিংশ শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতায় হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন। রামায়ণ-মহাভারতের অজস্র কাহিনী তাঁরা মুখে মুখে রচনা করে আবৃত্তি করে গেছেন। কবিয়ালদের গান মুখ্য, তবু ছড়াও তাঁরা আবৃত্তি কম করেননি। কবিগানের মাঝে মাঝে ছড়া আবৃত্তি করে সহৃদয় শ্রোতাদের প্রশংসা তারা অর্জন করেছেন।

ছিল সত্য ত্রেতা দ্বাপর শ্রেষ্ঠ, কলিকে ভেবে নিকৃষ্ট।
সকল লোক ঘৃণা বাসে মনে।
শুনিতে অধন্য কলি, কর্মগুণে ধন্য বলি
কর্মে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট কেমন ॥
সত্য যুগে পৃথিবীতে, মরে পুন জন্ম নিতে
লক্ষ বর্ষ ছিল পরমায়ু।
এক বার সৃষ্টি, একবার লয়, চিরকালই এমি হয়
কোন যুগে কে আছে চিরস্থায়ী ॥
কেহ ভাল কেহ মন্দ, দেবতা অসুরে দ্বন্দ্ব
নিশুম্ভ শুম্ভ চিরকালই হয়।
বামন রূপে বলির ঘরে, দান নিতে যায় পাতালপুরে।
সে দিন না সত্য কাল হয়॥

সত্য যুগে শত কর্ম, তখন ছিল সত্যধর্ম
ভাল বুঝিয়া সবে কয়।
আপন কন্যার গর্ভকরণ তুলসীর সতীত্ব হরণ
ধর্মের কর্ম সত্যের পরিচয়।
ইন্দ্রের পতন ঘটে, চন্দ্রের কলঙ্ক রটে
কয় জনাই বা সিদ্ধ যজ্ঞ যাগে।
মহারাজা অজামিলে, সেও ত' পাতকি ছিলে
বৈকুণ্ঠে যায় সকলের আগে।
পাপী আর পুণ্যবান, চারি যুগ এক সমান
পাপের কারণ যজ্ঞ করে রাম।
কলিকালে কি সৌভাগ্য নাই তপস্যা যাগযজ্ঞ
সব যজ্ঞ হবে কৃষ্ণ নাম।।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, পূর্বে যত আছে তারা
সকল বৃক্ষেতে আছে ফল।
আছে উদয় অস্ত পূর্বে নিয়ম যে সমস্ত
জোয়ার ভাটা নিত্য চলাচল।
এখনো হয় গঙ্গা স্নান, গয়াতে হয় পিণ্ড দান,
কাশীর মহত্ব আছে পূর্বের মতন।
একবার জন্মে, একবার মরে, এখনো সব ঘ'র ঘরে।
তার কিছু হয় নাই পরিবর্তন।।
ত্রেতাতে রাবণের বাড়ী চণ্ডী ছিল দ্বারের দ্বারী
ত্রিপুরারি আজ্ঞাকারী যার।
মালা যোগায় স্বর্গে বসে, যম ছিল যার ঘোড়ার ঘরে
বসূত্র বাবার্চি ছিল তার।।
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী নামেতে পাতকের শান্তি
তারা মন্দোদরী আদি সতী।
এমনি সতী কলিকালে খোঁজ করলে বহু মেলে
তাতে কলিকাল ধন্য অতি।।* —নদীয়া

টুসুগান

লোক সঙ্গীত

রামায়ণের প্রভাব পল্লী বালিকাকে যে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে নিম্নের টুসু গানে তার লৌকিক রূপায়ণ কিভাবে ঘটেছে, রাম-কথা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তা বুঝতে পারা যায়। টুসু-গানে আদি কবির নব রূপায়ণ বিস্ময় সৃষ্টি করে।

(১) রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া
তপোবনের কাননে,
লব-কুশ ধরেছে ঘোড়া
সীতা বলে দাও ছেড়ে
বিনা যুদ্ধ বিনে॥
রাম লক্ষ্মণ হেরে গেল দু-জনে,
বিনা যুদ্ধ বিনে॥ —বাঁশপাহাড়ী।

(২) রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া
তপোবনের কাননে।
লব কুশ ধরেছে ঘোড়া
সীতা বলেন-দাও ছেড়ে।
সোনার বরণ সীতা রইবেন কেমন?
রাম কি যাবেন বনে?
এসো এসো লক্ষ্মণ দেওর
রামের খোঁজে যাও দেখি।

(৩) অশোক বনে পাতার কুইড়া
সীতা পাশা খেইলাছে,
যোগীর বেশে রাবণ এসে
সীতাকে হইরে নিয়াছে।
ও রাম জটাধারী,
বনে গেলে কেমন ধৈর্য ধরি।
ও রাম জটাধারী। —বাঁশপাহাড়ী।

(৪) অশোক বনে পাতের কুঁড়ে, সীতা পাশা খেলেছে,
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরে নিয়েছে।

রাম নাকিয়ে বনে যাবি, হাতে নেবে পরীবাণ,
চোদ্দ বছর বনে যাবি কেড়ে নেবে মায়ের প্রাণ।
রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া তপোবনের কিনারে,
লব-কুশ ধরেছে ঘোড়া সীতা বলে দাও ছেড়ে।

—বাঁশপাহাড়ী।

(২) অশোক বনে পাতের কুঁড়ে
সীতা পাশা খেলেছে,
মুনির বেশে রাবণ এসে
সীতা হরণ করেছে।
হরণ করলে তাই করলে
রাখবে সীতায় যতনে।
সোনার লঙ্কা ছারখার করবে
একাই হনুমানে।

—বাঁশপাহাড়ী।

ভাদু গান

বর্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চলে ভাদু পূজার প্রভাবে তুষু পূজা একটু ভিন্ন রূপ নেয়। ভাদু প্রতিমার রং হলুদ। মাটির তুষু ঠাকুরণও হলুদ রঙে পরিবর্তিত হয়। ভাদু প্রতিমা সাধারণতঃ ছোট পুতুলের মত। কেউ কেউ যমপুকুর ব্রতের মত ছোট পুকুর কেটে তুষু ঠাকুরাণীর পূজা করে। এই পূজা যমপুকুরের ব্রতের প্রভাবেও হতে পারে।

যে সমস্ত অঞ্চলে ভাদুর মত প্রতিমা নির্মাণ করে তুষু বা টুসু-পূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও টুসু গান প্রচলিত।

টুসুর বিদায় সঙ্গীতের মত ভাদুর বিদায় সঙ্গীতও রোদন ভরা।

মানভূম জেলায় ভাদু-টুসু গান সিংহভূম জেলার সেরাইকেলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। সেরাইকেলার মেয়েরা ওড়িয়া ভাষায় সামান্য রূপান্তর করে ভাদু গান গায়।

ভাদু গানের সঙ্গে টুসু গানের বিশেষ কোন প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাল্মীকির তপোবনে লব-কুশ যজ্ঞের ঘোড়া ধরে, মায়ের মন চঞ্চল হয়ে উঠে। অভাগিনী সীতা ঘোড়া ছেড়ে দিতে আবেদন জানান।

রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া বাল্মীকির তপোবনে।
লব-কুশ ধরেন ঘোড়া, সীতা বলেন দাও ছেড়ে ॥
ছাড়ব না ছাড়ব না ঘোড়া ছাড়ব না বিনা রণে।
আসুন দেখি শ্রীরামচন্দ্র রণ করুন আমার সনে ॥
এই গো ছিল মনে জনক নন্দিনী সীতা।
পাঠাইলেন বনে গো, এই ছিল মনে ॥[৬]

জাওলু ভাদর গীত

পশ্চিম বাংলার নদীয়া জেলায় "জাওলু ভাদর গীত" বিশেষভাবে প্রচলিত। জাওলু ভাদর ভাদ্র মাসের কৃষি-লক্ষ্মী। ভাদ্র মাসে তাঁর আবির্ভাব, ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে তাঁর বিদায়। বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাদু-ঠাকুরাণীই একটি স্বতন্ত্র রূপে আবির্ভূতা হন।

এই গানে রামকথার বিশেষ প্রভাব নেই। কেবল মাত্র 'রাম' এই কথাটি এ গানে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলার লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত লোকসঙ্গীত আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে। তার বহু গানেই দেখা যায় 'রাম' কথাটির প্রয়োগ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের নাম-তত্ত্ব যে কি ভাবে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছিল, বাংলার লোকসঙ্গীতে তার উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

শিরি ছিপি ঢাকনা পাটি
কানে গুঁজে দে লো ॥
যা গাই তোর বড় দাদার বো লো।
বো লো দেখে যা জাওলু রাসে
রাম লো,
ভাদর শেষে রংএর ছটা দেখে যা লো ॥
আর কি পাবি এমন দিনে
জাওলু মায়ের মেলা ॥
কপালে তোর আর কি আছে।
এমনই কি যাবের বো লো ॥[৭]

৮

ব্যবহারিক সঙ্গীত : বিয়ের গান

'বিয়ের গান' বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ মূল্যবান বিভাগ। রাম-সীতার প্রসঙ্গেই মেয়েলী 'বিবাহ-সঙ্গীত' রচিত। কেবল বাংলা দেশে নয়, উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু সমাজে বিবাহোপলক্ষে 'বিয়ের গান' শুনতে পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কের মধ্যে যত বড় আধ্যাত্মিক আদর্শই থাক না কেন, এই সম্পর্ক পারিবারিক জীবনের আদর্শের বিরোধী। অতএব রামায়ণ বর্ণিত রাম-সীতাই এ সঙ্গীতের উপজীব্য বিষয়।

এখানে রাম অযোধ্যার রাজপুত্র নয়, জননীও কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা নয়। রামের মা গামছা দিয়ে ছেলের গা মুছিয়ে দেয়। আঁচলে কড়ি বেঁধে বেনের বাড়ী থেকে বর সজ্জার জন্যে সিঁদুর কিনে আনে। এই খাঁটি বাঙালী রাম-ই বাংলার বিয়ের গানের নায়ক।

জোগারে মঙ্গল ধ্বনি,
আইস, আইস, ওরে শচী নীলমণি।
ঘরের খনে জিজ্ঞাসেন রায়,—
কি কি শোভে আমার রামের গায়?
হস্তে শোভে হস্ত জোতি—
গলায় শোভে রামের গজমোতি।
রৌদ্রে ঘামাইছে বাছা,
ক্ষুধায় ঘামাইছে বাছা,
কি চন্দ্র বদন ওগো রামের মা।
কইগো রামের দাসী।
গামছা আন রামের বদন মুছি—।
অঞ্চলে বান্ধিয়া কড়ি।
যান ওগো রামের বাইন্যা বাড়ী।
হাজেরে বাইন্যা ছেইলা।
কত লইবা রে তোমার সিন্দুর তোলা?
আমার সিন্দুরের মূল্য, সোনার পাঁচ ঘড়া
ওগো রামের মা।[৫৮]

বাসি বিয়ের গান

ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলের বিয়ের একটা আচারের নাম বাসি বিয়ে। পশ্চিম-বঙ্গেও এর প্রচলন আছে। বাসি বিয়ে কোন শাস্ত্রীয় আচার নয়, স্ত্রী-আচার মাত্র। বাসি বিয়ে উপলক্ষে বাংলা দেশে যে মেয়েলি গান শুনতে পাওয়া যায়, তাকে বাসি বিয়ের গান বলে। বাসি বিয়ের অনুষ্ঠানকে মেয়েমহলে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শ্রীরাম চন্দ্রের বাসি বিয়া মিথিলায়।
দেখতে রামের বিয়া স্বর্গপুরের বাসী যারা,
গোপনে থেইকে চায়।
যেমন, রাম স্যাজল কমল আঁখি
তেমন-ই সীতা বিধুমুখী তরুতলে দাঁড়াইল।
ও তার জগতে—রূপ মোহিল।
স্বর্গ থেইকে দেবগণ পুষ্প বরিষণ করে।
ঐরূপ যে দেখিল নয়ন ভইরে,
তার জন্ম সফল হৈল।[৯]

—ঢাকা।

আয়োজন

বিয়ের আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর আশীর্বাদ অনুষ্ঠিত হয়। এই আশীর্বাদ উপলক্ষে ছেলের বাড়ীতে এয়োরা গান গায়।

আমি যাব সেই অশোক বনে, জানকীর অন্বেষণে,
ওই হলুদ লাগে বানিয়ার চন্দন লাগে,
পুরায় ওই হলুদ লাগে, বানিয়ার চন্দন লাগে,
জানকীরে আনতে গেলে এই সব লাগে গো।[১০]

—রাজশাহী।

কানেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া সাজে
রামচন্দ্র চলিলেন সীতার বাসরে।
যদি রে সুন্দর রামেরে সীতা কর বিয়া,
জনক বাপের বড়—ধনু চড়াও গিয়া।

বসিবে সুন্দর রাম, সীতা কয় বিয়া,
বাটা ভরা অলঙ্কার লইয়া আন গিয়া।
রামেত লইল জিনিষ বাটায় ভরিয়া,
লক্ষ্মণে লইল নোলক কডরায় ভরিয়া।
তর মায় যে কইছিল গো কন্যা, নিধন্যা বলিয়া,
পর গো পর গো কন্যা, পছিয়া বাছিয়া।
ঘুমেতে চঞ্চল সীতা বিদায় কাতর
জিনিস ফালাইয়া দিল পালঙ্কের উপর।
একেতো সুন্দর রাম বুদ্ধির সাগর,
জিনিষ টুকাইয়া লইল পান ডেঁকর উপর।[১১]

—ত্রিপুরা।

অনুষ্ঠান

বৃদ্ধি কাজের সময় এ সঙ্গীত গীত হয়।

ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।
বিচিত্র সামিয়ানার নীচে, বৃদ্ধি করেন দশরথে।।
ওগো ষোল মন মুগ লাগে গো,
ওগো শুভবৃদ্ধি করেন দশরথে।
ওগো বৃদ্ধি কার্যে কি কি লাগে,
ষোল-ছড়া কলা লাগে,
ষোল রাইড চুই লাগে, ষোল রাইড গুড় লাগে,
ওগো ষোল খানা সিন্দুর লাগে।
বিচিত্র সামিয়ানার নীচে ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথ।
ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথ।
বৃদ্ধি কার্যে কি কি লাগে, ষোল খানা কাপড় লাগে,
ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।
বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে ষোল খানা গামছা লাগে,
ওগো রাণী গো, ভাল বৃদ্ধি করেন দশরথে।

বৃদ্ধির কার্যে কি কি লাগে,
ষোল ছড়া সুপারী লাগে,
বিচিত্র শামিয়ানার নীচে
বৃদ্ধি করেন দশরথে ।।
বটপাতা গোটা গোটা
সিন্দুরের দিয়া ফোঁটা
বৃদ্ধি করলে কি কি ফল,
পিতৃ পুরুষ পাবে জল ।।[১২]

—ঢাকা (বিক্রমপুর)।

সখী, দেখ এ কি অপরূপ দেখ,
নান্দী মুখে বসিয়াছেন রাজা দশরথে।
পূর্ব দিনে মহারাজা করিয়া সংযম,
নানা রীতি দ্রব্য রাজা করি আয়োজন।
কুশ হাতে লইয়া রাজা বসিলেন কুশাসন।
মাতা সহ পিতা সহ মাতামহী আদি।
পুরোহিত কয় মন্ত্র দশরথ স্থান
একে একে বইলা দিল চৌদ্দ পুরুষের নাম।
নানা মত বাদ্য বাজে অযোধ্যা ভবনে
নান্দী মুখ করে রাজা হরষিত মনে।[১৩]

—মৈমনসিংহ।

দেখ দেখ কি আনন্দ অযোধ্যা ভবনে
কামাও নাপিত, কামাও রামধনে।
বাটুল কড়ি ছত্র ধরি, নাপিতের ছেলে করে খেউরী,
রাম হাতে দর্পণ ধরি বইস্যাছে আসনে।
কামাও নাপিত, কামাও রামধনে,
কামাও নাপিত, কামাও রামধনে,
খেউরী কর্ম হল সাঙ্গ, নারীগণে করে রঙ্গ,
মুখচন্দ্র দৃষ্ট করি লজ্জা ইন্দ্র পায় মনে।[১৪]

—মৈমনসিংহ।

সীতাদেবীর তৈল কাপড়ে 'বন্দেমাতরম' লেখার মধ্যে স্বদেশী যুগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ;—

ওহে ভারতবাসী, দেখ দেখ আসি আইজ মিথিলা নগরে,
রংরেজের পসার সারি সারি, জামুয়ার বেড়িল বাড়ী
সীতাদেবীর তৈল কাপড়ে।
আইল দধির ভাণ্ড, দেখ বঙ্গমা কি প্রকাণ্ড
পাঠায়েছে শঙ্খ সিন্দুর,
সীতাদেবীর তৈল কাপড়ে।
পাঠাইয়াছে গুয়া পান, পর্বত প্রমাণ
পাঠাইয়াছে তৈল ভৃঙ্গারে,
সীতাদেবীর তৈল কাপড়ে।
পাঠাইয়াছে স্বদেশী শাড়ী খদ্দরের বড়-পাড়ী,
বন্দেমাতরম্ লেখা পাড়ে,
সীতাদেবীর তৈল কাপড়ে।
পাঠাইয়াছে চরকা তুলা, নাটাই টাকুয়ার মেলা
যত দণ্ড সূতা বুনি বারে।
সীতাদেবীর তৈল কাপড়ে।
বন্দেমাতরম্ বলি, আসিয়া গুছাইয়া তুলি
সকলই রাখাইয়া ঘরে,
সীতাদেবীর তৈল কাপড়ে।[১০]

—গোয়ালপাড়া, আসাম।

দধি মঙ্গলের গান

পূর্ব বাংলায় (বাংলা দেশ) হিন্দু বিয়ের আচার সঙ্গীত—

দধি মঙ্গল করে সীতা রাণী গো,
আয় সকলে আমার নীলমণি।[১১]

—ঢাকা, বিক্রমপুর।

নিশি ভোর হল একণে
ভোর হল নিশি, অস্ত গেল শশী
রাম লয়ে তোরা বসে যা ভোজনে।

আন দধি, আন চিড়া
ছানার সন্দেশ ক্ষীর
রাম লয়ে তোমরা বসো না ভোজনে ।[১৭]

—ঢাকা, বিক্রমপুর ।

বিয়ে উপলক্ষে স্নানের সময় মেয়েদের গান

আট গাছি রাম কলা, ষোল ঝাড়ি জল ।
তাহার মধ্যে স্নান করেন রূপের বিদ্যাধর ।।
ঘরের থনে বাহির হইলেন রাজ-মহারাণী ।
ডাইন হস্তে কুল-হরিদ্র, বাম হস্তে ঝাড়ি ।।
সভার মধ্যে গিয়া রাণী চতুর্দিকে চায় ।
কারো ধরেন হস্তে রাণী, কারো ধরেন পায় ।।
সীতার মায় মিনতি করে, শুন আইয়োগণ ।
শুভে, শুভে যাক চন্দন অতি দুঃখের ধন ।।
নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া সীতার অঙ্গ
করিলেন শুচি ।
রাম পায়ে ভাঙ্গেন সীতা কুমারের মুচি ।।[১৮]

অধিবাসের দিন বরকে স্নান করার সময়ে মেয়েলী গান

তোরা আয়গো সকলে
আমার রাম-সীতাকে স্নান করাব
সুশীতল জলে ।
স্বর্ণ কুম্ভ ভরিয়া আন গঙ্গা জল,
ঢাল গো রামের শিরে
বাদ্যকর ডেকে আনরে, ধোপার ছেলে ডেকে আন,
ছুতোরের পিঁড়ি আন, নব-গঙ্গার জল আন,
তোরা আয়গো সকলে,
আমার রাম-সীতাকে স্নান করাব মনের আনন্দে ।[১৯]

—বিক্রমপুর, ঢাকা ।

তোরা আয়লো সকলে,
আমার সীতানাথকে স্নান করাইবাম
সুশীতল জলে।
খিলা আর হরিদ্রা বাটি,
শীঘ্র কইর‍্যা আন দেখি,
আমার রামের অঙ্গে মাখি সকলে মিলে।
আম্রপল্লব দিয়া, ভৃঙ্গার ভরিয়া,
রাখিয়া দিয়াছি—সখি ঐ ছায়াতলে।
কুসুম কস্তুরী চুয়া, কর্পূর তাতে ছুঁয়া
গন্ধ জলে ধুয়াইব আমার রামকমলে।
চিকন গামছা দিয়া, দিব অঙ্গ মুছাইয়া
ফুটিবে চম্পক কলি হাতে পায়ে আঙুলে।
আমার সীতানাথকে স্নান করাইবাম।
সুশীতল জলে।[২০]

—মৈমনসিংহ।

চল দুর্গা গো চল নিমন্ত্রণে
ত্বরাই করে নিশীথ প্রভাতে।
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে॥
পদ্মা চল গো চল নিমন্ত্রণে ত্বরাই করে—
নিশীথ প্রভাতে।
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে॥
গঙ্গা, চল গো চল নিমন্ত্রণে ত্বরা করে—
নিশীথ প্রভাতে।
রামচন্দ্র রাজা হবে যাইতে হবে তোমার,
তোমার যাইতে হবে অতি সকালে॥[২১]

—বরিশাল।

নিশি না প্রভাত কালে ও দশরথ কৌশল্যায়ে ডাইকা বলে।
তোমরা জয়ের ধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে সকালে॥

নিশি না প্রভাত কালে, কৈকেয়ীরে ডাইকা বলে,
তোমরা শুভ ধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে ভাল দিনে ॥
তোমরা জয় ধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে শুভ দিনে।
রাজা হবে রাজ্য পাবে, রাজসিংহাসনে বসে।
তোমরা জয়ের ধ্বনি বল সকলে, ভাল দিনে শ্রীরাম রাজা হবে ॥
নিশি না প্রভাত কালে, সুমিত্রারে ডেকে বলে,
তোমরা জয়ের ধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে ভাল দিনে।
তোমরা শুভ ধ্বনি বল সকলে, শ্রীরাম রাজা হবে শুভ দিনে।
রাজা হবে রাজ্য পাবে সীতা লক্ষ্মী বামে বসে,
তোমার জনম সাফল্য হবে,
শ্রীরাম দরশনে।
সখিগো, তোমার জনম সাফল্য হবে,
শ্রীরাম দরশনে ॥[২২]

—বরিশাল।

পাত্রের বাড়ীতে বিয়ের আগের দিন পাত্রকে সাজিয়ে দিয়ে যাত্রা করিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময়ে বর সাজান উপলক্ষে এই সঙ্গীত গীত হয়। এই ভাবে বস্ত্র, বলয়, কাজল, নূপুর, মুকুট ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার কথা গানের মধ্যে পাওয়া যায়।

দশরথের নারী বরণ কুলা সাজন করি
অই যে সাজায় কুলায় হীরা মণ মানিক রাম রঘুনাথে,
দশরথের মনের সাধ, রাজা হবে রঘুনাথ,
দশরথের নারী, অর্ঘসরা সাজন করি,
সাজায় কুলায় হীরা মণ মানিক রঘুনাথ।[২৩]

—বরিশাল।

তোমরা রাম সাজাইতে জান না
রামের সাজ ভাল দেখায় না,
ওরে সাজ ঘরে নিয়ে থুইলা ফেলে,
ফিরে রাম সাজাও গে,
তোমার তাঁতিয়ার জোড় দিয়া—
রাম সাজাইতে জান না।

রামের সাজ ভাল দেখায় না ।।
তোমরা ঘরে গিয়ে খুইলা ফেলে
ফিরে রাম সাজাও গে
ওগো তোমরা সোনার গহনা দিয়া
সাজাইতে জান না ।
রামের অঙ্গ ভাল দেখায় না ।।
এ সাজ ঘরে খুইলা ফেলে,
আবার রাম সাজাও গে,
তোমরা পুষ্প মালা দিয়া
তোমরা রাম সাজাইতে জান না ।
রামের সাজ ভাল দেখায় না । [২৪]

—মৈমনসিংহ ।

কনে সাজানোর গান

(১) আইওগণ ফুল আন তোরা চলে,
সাজাইতে হবে সীতার গলায় মোহন মালা ।
হাতে কঙ্কণ বাজে, চল যাই, চল যাই সখী,
রাম-সীতারে সাজাইতে ।
এক রামের সুন্দর আঁখি, তাহে শোভে
কাজল রেখি,
তারা কাল দিয়ে সাজায়েছ—
আর কি বাকী রেখেছ ।
একে রামের সুন্দর মাজা
তাতে শোভে চেলির কোচা ।
আহা, চেলি, দিয়ে সাজায়েছ,
আর কি বাকী রেখেছ । [২৫]

—বরিশাল ।

একে রামের চিকণ মাথা,
তাইতে শোভা করে তাঁতীর জোড়ে।
আমার রামের রূপে আলো করে,
আমার সীতার রূপে আলো করে,
দেখ না সখী, তোমরা হে—নেহার কইরে।
একে রামের মাজা অঙ্গ
আইতে শোভে কড়ির গহনা,
আমার রামের রূপে আলো করে,
দেখ না, সখী, তোমরা নেহার কইরে।
আমার একে রামের ছাঁটি বাবরী,
তাহাতে ওই শোভা,
আমার রামের রূপে আলো করে,
আমার সীতার রূপে আলো করে।
সাজাইয়া দেখ না, সখী
তোমরা নিহার দেখে—।[১৬] —বরিশাল।

উপরোক্ত গানটি মুসলমান সমাজে প্রচলিত। রামকথা কেবল মাত্র হিন্দু সমাজকেই ভক্তিরসে আপ্লুত করেনি, মুসলমান সমাজেও রামকথা অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার লোকসমাজ কেবলমাত্র হিন্দুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেনি, মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ গ্রাম বাংলার লোকসাহিত্যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এ-গান বাৎসল্য রসের এক সুন্দর নিদর্শন। হনুমান এ-গানে রাম-লক্ষ্মণের পাশে অংশ গ্রহণ করেছে।

রামো সাজে, হনুমানেরে কি দিয়া
সাজাব বাবাজান আমারে।
ঘরে তো আছে পাঁচশত টাকার মুকুটরে,
তা দিয়া সাজাবো লক্ষ্মণ তোরে।
রামো সাজে, রামো সাজে, হনুমানেরে কি দিয়া
সাজাব বাবাজান আমারে।
ঘরে তো আছে কলকাতারও শাড়ীরে তা দিয়া
সাজাব লক্ষ্মণ তোমারে

বাজো সাজে, বাজো সাজে, লক্ষ্মণেরে কি দিয়ে
 সাজাব বাবাজান আমারে।
ঘরে তো আছে বাসেরং-তৈল
 তা দিয়া সাজাবে,
 লক্ষ্মণ তোমারে।[২৭]

—ফরিদপুর।

পদ্মের পাতে জল যেমন রে,
 তেমন মিথিলা নগর রে,
রামচন্দ্র বিয়ার সাজেরে।
রামের মাও ভাগ্যবতীরে,
 মাও রামক সাজন করে রে।
কোমরে তুলিয়া দিলোরে
 মাও অগ্নিপাটের ধুতিরে,
গায়েতে তুলিয়া দিলোরে মাও উড়ানী চাদর রে,
মাথায় তুলিয়া দিলোরে মাও মণিরাজ পাগিড়ারে,
গায়ে পড়াইয়া দিলোরে—
 মাও বানাতিয়া কুর্তারে,
রামের মাও ভাগ্যবতীরে, মাও রামক সজনরে,
 রামচন্দ্র বিয়ার সাজেরে।[২৮]

—গোয়ালপাড়া, আসাম।

তোরা উলুধ্বনি দে,
ঠাকুরাণীর আইজ ফুল ফুটেছে সরোবরে।
উলুধ্বনি দেলো তোরা, শঙ্খের ধ্বনি দে,
সত্যবান আর সাবিত্রীর আজ হইবে বিয়া।
শুন বোন কাদম্বিনী, সৌদামিনী, মনমোহিনী,
দেলো তোরা উলুধ্বনি ঐ ফুল খান মাথায় নিয়া,
সত্যবান আর সাবিত্রীর আজ হইবে বিয়া।
তোরা উলুধ্বনি দে।[২৯]

—মৈমনসিংহ।

আসীকে সান্ত্বনার গান

রাম লক্ষ্মণ জোড়া কলা দুয়ারে গড়িয়া,
হেরো আইসে তোমার জামাই,
বাগুল ঘোড়ায় চড়িয়া
দেখো দেখো আইওগণ
জামাইর ক্যামন রূপ।
চাঁদ স্বরূপ দুই আঁখি,
হেঙ্গুল বরণ মুখ।
একে তো পণ্ডিত জামাই রাজহংস গলা,
গলায় দুলিয়া পড়ে সোনার কণ্ঠমালা,
গলায় দুলিয়া পড়ে গন্ধ পুষ্পের মালা।৩০

—গোয়ালপাড়া, আসাম।

মালা দান উপলক্ষে এয়োদের গান

তুমি যে সুন্দর রামরে
সীতায় করবা বিয়া
সে কি গহনা আনছ
রামরে, সীতার লাগিয়া,
এনেছি এনেছি গয়না পেটরাটি ভরিয়া,
পর সীতে, পর গয়না, টোপরটি খুলিয়া।৩২ —ফরিদপুর

শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিমার সময়ে মেয়েলি গান

ধইরা তোল ধইরা তোল রামের সিংহাসন।
ধইরা তোল সীতারই আসন।।
রামের গলে সোনার মালা।।
সীতার হস্তে সোনার বালা।।
দুই মুখে চারি চোখে হইল দরশন।
পুরোহিত আইসা বলে হইল শুভক্ষণ।
রাজ-হংসের পঙক্তির ভাঙলো নিদ্রা।
ধুতরার সহস্র প্রদীপ ধরগো তুলিয়া।।৩৩

—বিক্রমপুর, ঢাকা।

পাশা খেলার সম্বন্ধে মেয়েদের গান

দেখ দেখি কি তামাশা,
খেলছে পাশা কন্যা বরে।
সীতায় যদি হারে পাশায়,
দাসী হয়ে মন যোগাবে ॥
রামে যদি হারে পাশায়
সর্বস্ব ধন পণ করিবে।[৩৩] —ঢাকা।

পূর্বের গানটির মতই নিম্নোক্ত গানগুলি পাশা খেলাকে কেন্দ্র করে গীত হয়।

রামচন্দ্র খেলে পাশা গো সীতারে লইয়া।
লক্ষ্মীর সহিত পাশা গো খেলে নারায়ণ।
ইন্দ্র যেন খেলে পাশা গো শচীরাণী সনে।
মদনের সহিত পাশা গো খেলে যেন রতি।
হরের সহিত কিংবা গো খেলায় পার্বতী ॥[৩৪]

—পূর্ব মৈমনসিংহ।

স্ত্রী-আচার সম্পর্কিত এই পাশা খেলায় সীতা সাধারণতঃ জয়লাভ করেন, রাম পরাজিত হন।

ছি ছি ছি
লাজে মরি
শ্রীরাম হারিল খেলায়,
জিতল জানকী।[৩৫]

বিনোদ মন্দিরে রাম বিনোদ বেশেতে
বিনোদ বিনোদিনী খেলা লাগিলেন দেখিতে।
খেলিতে বসিয়া সীতা ছাড়িলেন দান,
হারাইয়া গেলেন রামচন্দ্র লজ্জিত বয়ান।[৩৬]

—মৈমন সিংহ।

সোনার রূপার দুটি পাশা, পাশা খেলে ভগবান।
বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকা পাশায় করে মান।
পাশায় হারিয়া সীতারে, সীতা কাঁদিতে লাগিল,
দুই হাতে ধরিয়া রাম বুঝাইতে লাগিলরে,
পাশা খেলেরে।

না কান্দিয়ো, ওগো সীতা, না কান্দিয়ো তুমি,
আমার কাছে আছে যাদুধন, পালন করবে যে।[৩৭]

—বরিশাল।

পাশা খেলার গান কেবল মাত্র স্ত্রী-আচার নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে এ-গান পুরুষের সমাজেও প্রচলিত আছে। মুসলমান সমাজেও এ-গান প্রচলিত। এয়োরা সাধারণতঃ এই গান গায়। নীচের গানটিতে রাম ও কৃষ্ণ একাকার হয়ে গেছেন। পল্লীকবি রামের হাতে বাঁশী তুলে দিয়েছেন।

পাশা খেলে কে গো, পাশা চালে কে গো,
পাশা খেলে কিশোর আর কিশোরী,
খেলিতে খেলিতে পাশা হারিলেন শ্রীহরি।
রামে চালে পাশা বারো সীতায় চালে তেরো,
লক্ষ্মণ উঠিয়া বলে, দাদা বুঝি হারো,
রামে যদি হারে পাশা হাতের বাঁশী,
সীতায় যদি হারে পাশা হব নিজ দাসী,
পাশা খেলে গো।[৩৮]

—ঢাকা।

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটিতে দ্বিজ বংশী দাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর ভণিতা পাওয়া গেছে।

আজি কি আনন্দ হৈল জনক ভুবনে।
রামচন্দ্র খেলছেন পাশা জানকীর সনে॥
উত্তম শীতল পাটী ফুলের বিছানা।
সখীরা করিতে রঙ্গ কত না বাহানা॥
আজি কি আনন্দ হৈল,
সোনার পাতিল কারা, সোনার একুশ ঘড়া
তাহাতে খেলিছে পাশা, অষ্ট সখী ঘেরা।
চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেলে বিনোদিনী—
পাশাতে হারিবেন এবার রামগুণমণি।[৩৯]

—মৈমনসিংহ।

কন্যা বিদায়ের গান

বিয়ের গানের মধ্যে কন্যা বিদায়ের গানই সর্বাপেক্ষা বাস্তব ও মর্মস্পর্শী। কন্যা বিদায়ের গানে কন্যার আত্মীয়রা কন্যার হয়ে কাঁদে। কন্যা নিজেও কখন কখনও গান গায়। বিদায়কালীন গান কন্যার নিজের গাওয়ার রীতি,—পূর্ব ও উত্তর বাংলায় প্রায় লুপ্ত হলেও এখন ও পশ্চিম বঙ্গে অর্থাৎ মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জের সংযোগ স্থলে এ রীতি প্রচলিত আছে।

আগে চলে সীতা, সীতা পাছে চলে রাম,
রামের আগে সীতা চলে সোনার গোলোকধাম।
যাত্রা করে সীতা সতী জনকের বালা,
রাম রাজার সাথে চলে হাজার ফুলের মালা।
কাঁদে মাতা, কাঁদে রাণী কাঁদে পুরনারী,
অঝোরে কাঁদিয়া ফেরে সীতার সহচরী।
কেঁদো না, কেঁদো না মাগো আবার আসিব।
মা বলে ডাকিয়া মাগো পরাণ জুড়াব।[৮০]

—রাজসাহী

কন্যা বিদায়ের অপর একটি গান। এ গানে কেবল সীতার কথাই আছে। এ সীতা রামকথার বিয়োগাত্মক মহাকাব্যের নায়িকা না হয়ে ঘরের আদুরে মেয়ে—ঘর ভাসিয়ে বিদায় নিয়ে চলেছে।

সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো।
বড় পুকুরের ভরই চিংড়ি কে খাইবে গো,
মাছের তলায় ছাতুর হাঁড়ি কে খাইবে গো।
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।[৮১]

বধূবরা বা বৌবরা উৎসবের গীত। পাত্রের বাড়ীতে যখন বরবধূ এসে উপস্থিত হল, তখন তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বরণ করাকে বৌবরা বলে।

মাগো, সীতা, স্বর্ণলতা মায়ের কথা রাইখো মনে,
যাইয়ে শ্বশুর ঘরে আপন ভাবিও সর্বজনে।[৮২]

—মৈমনসিংহ।

চল চল দেখি গিয়া,
রামচন্দ্র দেশে আইলেন জানকীরে লইয়া।

দূত দিয়া বার্তা কইলো কৌশল্যা গো রাণী,
তোমার রামচন্দ্র আইছে লইয়া জানকী।
দুয়ারে ফালাইয়া পিঁড়ি চাউল দিল মুঠি,
কড়ি দিল ষোলগণ্ডা জল দিল পঞ্চটি।
বাইর আইলো রাজরাণী কুলা মাথায় দিয়া,
ঘরে নিলো রামচন্দ্র সীতারে আগ্রিয়া।
রামের মাথায় ধান দূর্বা সীতার মুখে চিনি
দুয়ারে ফালাইয়া পিঁড়ি বসাইল রাজরাণী
বাৎসল্যের ভরে রাণীর গদ গদ তনু
কোলেতে বইস্যাছে রাম মেঘের বরণ তাহু।
রাণীগণে রঙ্গ-ভরে দিলাইল উলুধ্বনি,
এই মতে বধূবরা সাঙ্গ করলেন রাণী।[৪০]

—ময়মনসিংহ।

বধূ বরণের গান

কি কর রামের মাগো গৃহেতে বসিয়া,
তোমার রামচন্দ্র আসে জানকী লইয়া।
আবার বল আমি শুনিব শ্রবণে।
বাইর আইল কৌশল্যা গো
ধান দূর্বা লইয়া।
ধান দূর্বা চিনি সন্দেশ লইল হাতে হাতে।
বর বধূরে ঘরে লইল দূর্বা লয়ে সাথে।[৪১]

—ময়মনসিংহ।

স্নানের আগে হলুদ, মেথি ইত্যাদি এক সঙ্গে বেটে পাত্রপাত্রীর গায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মাখান হয়।

চল চলগো যাই
রামের কুরবাটিতে যাই—
মুগ আর হরিদ্রা লাগে,
পঞ্চজন আইয়ো লাগে।
সীতার কুরবাটিতে।[৪২]

—বিক্রমপুর, ঢাকা।

বিয়ে উপলক্ষে কতকগুলি কাহিনীমূলক গান শুনতে পাওয়া যায়। এখানে পারিজাত হরণের কাহিনী উল্লিখিত আছে। কিন্তু পারিজাত হরণকারী এখানে লক্ষণ। রামায়ণে লক্ষণকে এক আদর্শ পুরুষ হিসাবে আঁকা হয়েছে। লক্ষণের পারিজাত হরণের অপবাদ কোথাও নেই।

শুন রাজা, ধর্ম কথা পাণ্ডব নন্দন,
সেই মতে পারিজাত হরিল লক্ষণ।
পারিজাত বিনে আমি ত্যজিব জীবন।
ঊর্মিলার সত্য করে, লইয়া কইরা পণ,
পুষ্প বিনে বৃথা গেল এরূপ যৌবন।
একদিন জানকী আর ঊর্মিলা দুইজনে,
সবকথা স্মরণ কইরা জুড়িল ক্রন্দন।
এই মতে কান্দে তারা লুটাইয়া ধরণী
হেন কালে গৃহে আইলেন রাম রঘুমণি।
কিসের লাইগ্যা চন্দ্রমুখী করিছ ক্রন্দন,
আমার কি অসাধ্য আছে এ তিন ভুবন।
লঙ্কার রাবণ যখন হরিল তোমারে
অলঙ্ঘ্য সাগর আমি বান্ধলাম পাথরে।
পারিজাত পুষ্প আছে কৈলাস ভবন,
পারিজাত বিনে আমি ত্যজিব জীবন।
চল চল আরে দূত, চল শীঘ্র গতি,
শীঘ্র গিয়া লইয়া আইস লক্ষণ সারথি।
পারিজাত পুষ্প আছে কৈলাস ভবন
পারিজাত বিনে সীতা ত্যজিবে জীবন।

আইসরে প্রাণের ভাই, বলিব তোমার ঠাঁই
মোর দুঃখ কইনা অপরে।
পিতৃ সত্য বনবাস, মৃগ দেখি অভিলাষ
পাঠাইল ধরিতে মৃগেরে।
তুমি ছিলে যেথা যারা ত্যজিল কুলটা নারী
ভিক্ষা দিতে হল বাহির,
হরিয়া নিল রাবণ রইল অশোকবনে
তাতে দুঃখ পাইলাম বড়।

নিলাজ রমণী আজ   চাহিতেছে পারিজাত,
    কি করি বল না মোর ভাই।
শিব শিব দুইজন   সেখানে করে যাপন
    রইয়াছে মানস সরোবর,
আশুতোষ তুষ্ট কইরা,   পারিজাত আন হইয়া
    তুমি তার গুণের দেবর।
গুরুমন্ত্র জপ করি   লক্ষ্মণ গুণমণি
    উঠিলেন রথের উপর।
ধনুকের টান টানি,   লক্ষ্মণ গুণমণি
    কৈলাসেতে করেন গমন
লক্ষ্মণ কুমারে দেখি,   শিব ঢুলু ঢুলু আঁখি
    কহে, আইছ এই খানে কি কাম ?
যদি থাকে তোমার মনে   যুদ্ধ কর আমার সনে,
    লক্ষ্মণ ধানুকী আমার নাম।
তোমার মানস হৈতে   আইছি পারিজাত নিতে
    পাঠাইলেন দাশরথি রাম।
শুনিয়া রামের নাম   শঙ্কর হরিল জ্ঞান,
    যুদ্ধ না হইল তার সাথে।
আইলা। পুষ্প সমুদয়   লক্ষ্মণ দূতেরে কয়
    দেও নিয়া জানকীর হাতে।[৮৬]   —মৈমনসিংহ।

পাত্র মিত্র লৈয়া সঙ্গে   চলিলেন লক্ষ্মণ রঙ্গে
    বসিলেন লক্ষ্মণ সরোবরের তীরেরে
হেনকালে চন্দ্রকলা   সিনান করিতে গেলা
    রায় কন্যা সরোবরের তীরেরে।
নামিয়া জলের মাঝ   দেখিলেন যুবরাজ
    তাইতে হরিয়া নিল প্রাণের যুবরাজ।
সিনান করিয়া চন্দ্রকলা,   বাড়ীতে চলিয়া গেলা
    নাই কন্যার শয়ন ভোজন।
কখন পালঙ্কে শোয়,   কখন ভূমিতে লুটোয়,
    চন্দ্রকলার চরিত্র-চঞ্চল।

রাণী বলে মহামুনি সর্বতত্ত্ব জান তুমি।
জিজ্ঞাসিয়া বোঝ কন্যার মন।
মুনি বলে, চন্দ্রকলা, তোমার বিরহ জ্বালা,
কেন দেব হৈল দরশন।
কণ্ঠে বস্ত্র দিবামালা সেও পুরব ভালা
সেই দেব হৈল দরশন মুনিবর্য্য।
মুনি বলে চন্দ্রকলা, তোমার তপস্যার ভালা,
পতি দেবে রামের ভাই লক্ষ্মণ।
কৌশল্যা শাশুড়ী পাইলা দশরথ শ্বশুর পাইলা।
আর পাইল্যা অযোধ্যা নগর।[৭৭]

—ঢাকা

বিয়ের উৎসবের গান

জয় জয় শব্দ শুনিগো অযোধ্যা নগর
আর জয় জয় শব্দ শুনি মিথিলা নগর।
এক সখী সাইজ্যা আইল নানা বেশ
আর এক সখী সাইজ্যা আইল আচড়াইয়া কেশ
এক সখীর বাটায় পান গো আর এক সখী খায়
আনন্দ করিয়া তারা বিয়ার উৎসব গায়।[৭৮] —ঢাকা

নিম্নের বিবাহ-সঙ্গীতটির মধ্যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর ভিন্ন এক রূপের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক সমাজে এ-গান পল্লীগীতির আকারে গীত হয়ে থাকে। এ গানে সীতার চরিত্রের আদর্শের প্রতি কবির শ্রদ্ধা চোখে পড়ে। সীতার আদর্শ বাঙালী নারীর আদর্শ।

আমি তাইতে বিয়ে
করলাম না,
মনের মতো মেয়ে পেলাম না।
দেখি নকল মেয়ে সকল দেশে
আসল মেয়ে কয় জনা॥

মেয়ে ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া
স্বামী যার সন্ন্যাসী হয়ে
ও সে ঘরে বসে করে সাধন
অন্য দিকে চাইল না ।।
একটি মেয়ে ছিল যে সতী,
চৌদ্দ বছর বনে থেকে
আবার পেল সে পতি।
রাবণ গৃহে থেকে সতী
রাম ছাড়া কিছু জানে না,
বর্তমানে মেয়ে যারা
স্বামী পছন্দ করে না তারা।
তাদের ঝগড়া হলে, ঝাঁটা তোলে,
দেয় কত গঞ্জনা ।।[৫৯]

—মুর্শিদাবাদ।

বিয়ে উপলক্ষে শাশুড়ী কাপড়ের আঁচল দিয়ে বরের মুখ মোছায়। বরকে প্রদীপ জেলে বরণ করে। আশীর্বাদ করে।

মাদল গীত—

জনক নরপতি অতি হরষিতে
রামচন্দ্র করে দান, দান করে সীতে,
লগ্ন পাইয়া গুরু আচমন করে
বেদশাস্ত্র পড়ায় তাকে কুল-পুরোহিতে।[৬০]

আনুষ্ঠানিক গীতি

সামাজিক উৎসব উপলক্ষে যে গান গাওয়া হয় তাকেই মোটামুটিভাবে 'আনুষ্ঠানিক গীতি' বলা হয়। ইংরেজীতে ইহাদিগকে Calendric song অথবা Ritual song বলা হয়।[৬১] এই গান পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন, মালপুজোয় আদ্যের গম্ভীরা, ব্রতগীত প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। শিবের গাজন পশ্চিমবঙ্গের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। ধর্মের গাজন, নদীয়ায় কোন কোন

অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে। নীলপুজো উপলক্ষে পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) শিবের বিয়ে, পার্বতীর শাঁখা পরিধান, হর-পার্বতীর বিয়ে, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ প্রভৃতি পুরাণ কাহিনীমূলক সঙ্গীত বিশেষ ভাবে প্রচলিত। এই সব সঙ্গীতে পল্লী-কবিদের কবিত্ব শক্তির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈচিত্র্যহীন একটানা সুরে এই সব লোকসঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে নীলপুজো আস্তের নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের বা রাঢ় অঞ্চলের গাজনকে শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন বলা হয়। এই গানে শিব আর ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ শুনতে পাওয়া যায়, বীরভূমের ভাঁজোর সঙ্গীত আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অন্তর্গত। ভাঁজো গান সাধারণতঃ মেয়েরা নৃত্যের সঙ্গে গান করে থাকে।

ব্রতকথা ও ব্রতের গানকে আমরা পূর্বেই পার্বণাদি উপলক্ষে গীতের অন্তর্গত করেছি। কিন্তু মেয়েলী ব্রতের গীতকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অন্তর্গত করা চলে। কারণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই ব্রতের গান গাওয়া হয়ে থাকে।

পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) কার্ত্তিক ব্রত উপলক্ষে এখনও বিবাহিত মেয়েরা ব্রতের গান গেয়ে থাকে। কার্ত্তিক ব্রত উপলক্ষে মেয়েরা সারারাত জেগে ব্রতের গান গায়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সারা অঙ্গে বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, অথবা এ-দুই মহাকাব্য রচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই রামকথা বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। কি গাজন গানে কি ব্রতের গানে সর্বত্রই রামকথা ও ভারতকথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কার্ত্তিক ব্রতের গান

এই প্রসঙ্গে প্রথমে কার্ত্তিক ব্রতের গানের বন্দনা অংশে শিব-পার্বতী আর রামকথার প্রভাব লক্ষ্য করার মত।

উত্তরে বন্দিয়া আইলাম কৈলাস পর্বতেরে।
আর শেষে বন্দিয়া আইলাম শিব আর পার্বতীরে॥
দক্ষিণে বন্দিয়া আইলাম ক্ষীর নদী সাগরে।
পূর্বেতে বন্দিয়া আইলাম পূবের ভাস্বরে॥

পশ্চিমে বন্দিয়া আইলাম গয়া বারাণসীরে।
স্ত্রীর মধ্যে বন্দিয়া আইলাম সীতা বড়—সতীরে।
পুরুষের মধ্যে বন্দিয়া আইলাম রামচন্দ্র গোঁসাইরে।
গাইয়ের মধ্যে বন্দিয়া আইলাম ধবল—ধবলীরে ॥
মায়ের দুটি স্তন বন্দি অক্ষয় ভাণ্ডার রে।
গয়া কাশী গেলে ধার শুধিতে না পারিবে।[৫২]

বান্দুটি গান

নীলের গাজন উপলক্ষে 'বান্দুটি' গান শুনতে পাওয়া যায়। এই গান ধীর লয়ে গীত হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণ ও রামায়ণ প্রসঙ্গ এই গানের বিষয়বস্তু। এ-গানে করুণ রস স্থান লাভ করে। মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত এই গানে রামকথার করুণ কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

বান্দুটি গান সাধারণতঃ সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। সুর কীর্তনের মত, এই গানটিতে লক্ষ্মণের শক্তিশেলের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

কান্দে রাম রঘুমণি
ছাড়িয়ে দুই চোখের পাণি
হারা হলেন প্রাণের লক্ষ্মণ
উঠ উঠ ভাইরে লক্ষ্মণ উঠে বল কথা—
অভাগা রাম দাদা ডাকে গাত্র তুলে চল হেঁটে
দূরে যাক মোর ভ্রাতৃ শোকের ব্যথা।
কি কুক্ষণে তাইকে লয়ে, এসেছিলাম বনে
সৎমায়ের কানে সোনা
পূর্ণিমার চান্দের কণা—
হেন রত্ন কেন আনলাম বনে।[৫৩]

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, মালদহ জেলায় কোন কোন অংশে মুসলমান কৃষক সমাজে 'আলকাপ' গান শুনতে পাওয়া যায়। আলকাপের দুটি বিভাগ

আছে—(১) ছড়া, (২) গান। আলকাপের ছড়া সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আলকাপ-গানে রামকথার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সত্য যুগে ছিলাম আমি লক্ষ্মী নারায়ণ গো,
পূজিতে এলাম যুগল চরণ গো,
ত্রেতাতে রাম অবতার জন্ম দশরথের ঘরে—
রামের শত্রুতালা পণ, তোমার তাও কি নাই স্মরণ।
জনকের ধনুক ভেঙে সীতা তোমারে করলাম বিয়ে,
কোথাকার পাপিষ্ঠ রাবণ, সীতাকে করলে হরণ।
বিধাতার কুমন্ত্রণা ঘটে রাম গেল বনবাসে,
ননী চুরি, বসন চুরি, মস্তকে বেঁধেছে গিরি,
রাধার পুরাতে বাসনা নাম ধরি কেলে সোনা।
দ্বাপরের কথা শুনি দিয়া মন গো,
নন্দালয়ে ছিলাম আমি শ্রীনন্দের নন্দন গো,
ননী চুরি বসন চুরি। মস্তকে বেঁধেছি গিরি,
ছদ্ম-বেশে বৈদ্য সেজে বেড়াই আমি ব্রজের বেশে,
রাধার কলঙ্ক ঘোচায় বৃন্দে, তাইতে মান নাই,
তোমার জন্য রাধে, কল করি কি-না চায়রে।[৩৩]

—নদীয়া

আলকাপের ছুকাদার রচিত গান

সত্যযুগে ছিলাম আমি লক্ষ্মী নারায়ণ,
হর প্রিয়ার পূজিতে গিয়া যুগল চরণ গো,
ত্রেতায় ও রাম অবতারে জন্ম দশরথের ঘরে,
জনকের ধনুক ভাঙা পণ সেটা হয় নাকি স্মরণ গো।
জনকের ধনুক ভেঙে তোমায় বিবাহ করলাম বনে।
বিধাতার কুমন্ত্রণা ঘটে আমি গেলাম বনবাসে গো,
কোথাকার পাপিষ্ট রাবণ সীতাকে করিল হরণ,
সেখানে বেড়ায় কেঁদে কেঁদে আমি পড়লাম বিপদে গো।
প্রধান ভক্ত ছিল আমার বীর হনুমান
অশোকবনে ছিল সীতা করিল সন্ধান।

তোমাকে উদ্ধারিতে সাগর বাঁধে বানরেতে,
সেখানে অস্ত্র যুদ্ধ করে রাবণ স্বয়ং শেষে মরে।
তারপর দ্বাপরের কথা শুন দিয়া মন,
বৃন্দাবনে রাধার প্রিয়া শ্রীনন্দের নন্দন গো,
নন্দ হয় মোর পালনকর্তা, বাসুদেব হয় জন্মদাতা,
পিতা মাতা কারাগারে দুঃখ-দুঃখ জানাব কারে,
ছিলাম আমি ব্রজপুরে বেড়াই আমি ব্রজের দ্বারে দ্বারে।
ননী চুরি, বসন চুরি, মস্তকে ধরেছি গিরি,
ও-নাম ধরি ফেলে সোনা, শুচি করলো সে ব্রজের মাঝে।
ও-রাধার কলঙ্ক ঘুচায় তোর কি মনে নাই।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেতে তুমি প্রিয়া আমি স্বামী,
তোমার জন্যেতে বাদে করি নাই কি বল আমি।" —মুর্শিদাবাদ।

টীকা পরানের গীত

পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের ধর্ম-ঠাকুরের পুজো নামে যে লৌকিক উৎসব প্রচলিত আছে, সেই উৎসবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ললাটে চন্দনের টীকা ধারণ একটা আচার। ধর্ম পুজোর বিশেষ অনুষ্ঠানে এই আচার পালন করা হয়। রামাই পণ্ডিত নামে এক প্রাচীন ধর্ম-পুরোহিতের নামে এই ছড়া জাতীয় গান প্রচলিত।

ঘুরি ঘুরি চন্দন লহ সবিয়া লইব টিকা।
এক মনে পূজা কর শ্রীরামের পাদুকা॥
তিন যুগি বিশ্বকর্মা বিমাইল যে পাড়ি।
ষোলশ আমিনা মেলি এতি চন্দন ঘুরি॥
মলয়ার পর্বত যেথা আছিল চন্দন।
বায়ুর বেগে আসিয়াছিল পবন নন্দন॥
তিন যুগেতে চারি যুগে পীড়িত বন্দন।
সবগে বিশাই পীড়িত করিল নির্মাণ॥
চন্দনের কাঠ যদি আনিল হনুমান।
চন্দন ঘষিব ধর্ম দেবতার বিদ্যমান॥
খালি ঘুরি ভাবরে ভরিয়া লটি চন্দন।
সেই ত চন্দনেতে পূজিব যে নিরঞ্জন।
চন্দনের গন্ধেতে যতেক দূরে যায়।

চন্দনের গন্ধেতে মোহিত দেব রায় ।
গঙ্গার ঝিরিকা আন সাগরের পানি ।
চন্দনের খুরিতে কেটে হয় জয় ধ্বনি ।।* —শূন্যপুরাণ, বাঁকুড়া।

*খুরি—থলি।

পাতানাচের গান

ভাদ্র মাসে ইন্দ্র পুজোর আগের দিন যে পার্শ্ব একাদশী, সেই রাতে অনুষ্ঠিত হয় পাতানাচের অনুষ্ঠান। ঐ দিন গ্রামের সব ছেলেমেয়ে উপবাস করে। সন্ধ্যায় গ্রামের মোড়ল করম গাছের একটা ডাল কেটে এনে পুঁতে দেয়। ছেলে-মেয়েরা স্নান সেরে আসে। তারপর নতুন জামা-কাপড় পরে পুজোর উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হয় মোড়লের পোঁতা করম গাছের ডালের কাছে। অনুষ্ঠানে ধান গাছের পাতাকেই বিশেষভাবে ফুলের মত ব্যবহার করা হয়। ছেলে-মেয়েরা করম গাছের পাতায় সিঁদুর, গুঁড়ি চন্দন প্রভৃতি দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ডালকে আলিঙ্গন করে। তারপর ডালের তলায় প্রণাম করে ঘরে ফিরে যায়। রাতে শুরু হয় পাতানাচের অনুষ্ঠান।

পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সমাজে পাতানাচ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান তাদের জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। গানের ভাষা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয়, কিন্তু বর্তমানে আদিবাসী সমাজে বাংলা ভাষায় গান রচিত হয়। ফলে বাংলা ভাষাতে বেশী পাতানাচের গান শোনা যায়। ভবিষ্যতে জীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী এই অনুষ্ঠানে মনোনীত করা হয়। এই অনুষ্ঠান এই জন্যেই আদিবাসী সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। অনেকে এই জন্যেই এই অনুষ্ঠানকে পাতানাচ বলেন, আবার কেউ কেউ মনে করেন, করম গাছের ডালকে ঘিরে এই অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয় বলে এই উৎসবের নাম পাতানাচ। এখন নানা উৎসব অনুষ্ঠানে পাতানাচ হয়ে থাকে। কোন কোন সময়ে আবার অবসর বিনোদনের জন্যেও পাতানাচ অনুষ্ঠিত হয়।

পালের মধ্যে গাভী ভাল
ধবলা শ্যামলী রে।
গড়ের মধ্যে রাজা ভাল
শ্রীরাম লক্ষ্মণ রে ।।[৫৭]

রাম রাবণে যুদ্ধ হয়েছিল লঙ্কাপুরে—
বুকে শেল মারিল রাবণে গো
সীতা লয়ে লঙ্কাকে গেল।[৫৮]

-বেলপাহাড়ী।

রাম যদি রাজা হোত সীতা হোত ধনী রে।
পঞ্চবটী বনে সীতা কে করিল চুরি রে।[৫৯]

—বেলপাহাড়ী।

নিম্নোদ্ধৃত গানটি লক্ষ্য করার মত, এ-গানে বাংলা শব্দের সঙ্গে নির্বিচারে হিন্দী বা কুর্মালি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীতের এ-একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের লোকসাহিত্যে আদিবাসীর ভাষার উপর প্রতিবেশীর ভাষা প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমান পাতানাচের গানগুলি তার সুন্দর উদাহরণ—

মন, দিন গেল, এ জনমের পারা,
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই জগতেরি সেরা।
কি কর কি কর ভাই, সসে দিশাহারা,
পদ্মপাতার জল, সে জল করে টলমল,
পড়িতে বিলম্ব নাই ফলে আছে ঠাসা,
মন, দিন গেল, এ জনমের পারা॥[৬০]

—বেলপাহাড়ী।

ছোট ছোট হনুগুলো দুদা দুলা পেট,
বাছা হনুরে, সাগর ডিঙ্গিতেই মাথা হেঁট।
খাইতে নারিকেল, ফেলাইতে চপা,
বাছা হনুরে, দেখ চপা অশোকের বনে।[৬১]

—বেলপাহাড়ী

ভীম অর্জুনের কুলি যোরা
সজন মুখী ধান হে,
হাতে শাঁখা, কোমর গাঁকা,
মাথায় গাঁদা ফুল হে।[৬২]

—পচাপানি।

গাজন

চৈত্রের গাজন গান রাঢ় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই শুনতে পাওয়া যায়। এই গাজন কোথাও শিবের গাজন আবার কোথাও বা ধর্মের গাজন নামে পরিচিত। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতেই এই গাজনের গান পশ্চিমবঙ্গের সারা পল্লী-অঞ্চলকে মাতিয়ে তোলে। ইঁট কাঠে ঘেরা এই শহরেও গাজনের গান শুনতে পাওয়া যায়। চৈত্র মাস ভোর সন্ন্যাসীরা শিবের নামে ভিক্ষে ক'রে চৈত্র মাসের শেষ তিনদিন আবার কোথাও কোথাও বৈশাখী পূর্ণিমার তিথিতে গাজন গানের মধ্য দিয়ে শিব ঠাকুরের আর ধর্মঠাকুরের নামে গান গেয়ে ফেরে। চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব পশ্চিমবাংলায় প্রায় জাতীয় উৎসবের রূপ নেয়। ছোট শিশুরাও বড়দের সঙ্গে এ উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। বৈশাখী সংক্রান্তির দিন বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে শিবের গাজন হয়, আবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে কোথাও কোথাও ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

গাজন গান সম্পর্কে অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গবাসীর অল্পবিস্তর পরিচিতি আছে। এই গানে কোন উচ্চাঙ্গের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, তবে এই সব গানে প্রায়ই রামকথার নানা প্রসঙ্গ শুনতে পাওয়া যায়। রামায়ণের মধ্যে পারিবারিক জীবন সম্পর্ক যেমন সীতা হরণে রামের অন্তর্দাহ, শক্তিশেলে লক্ষ্মণের পতন, রামের বিলাপ, সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র প্রভৃতি কাহিনী-মূলক গান মুখ্য স্থান অধিকার করে। রামচন্দ্রের যুদ্ধ বৃত্তান্তও গাজন গানে শুনতে পাওয়া যায়।

মোট কথা গাজন গানের মধ্য দিয়ে আমরা রামায়ণের নবরূপায়ণ দেখতে পাই।

গাজন গানে ছড়া জাতীয় কবিতা, বা গানের মতই গীত হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত গানে শিব চাষের দেবতা, মহাভারতের ভীম তাঁর সাথী। ভোলানাথ চিরকালই ঘরছাড়া-আপন-ভোলা। তিনি পালনকর্তা, মুক্তিদাতা। ভীমকে সঙ্গে নিয়ে ভোলা মহেশ্বর চাষ করতে যান. দ্বাদশ বছর শিব ঘরমুখো হন না। তাঁর গলায় হাড়ের মালা দোলে।

রামকথার মতই ভারতকথার কয়েকটি চরিত্রের কিছু কিছু অংশ গাজন গানে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

তিনি তো পালন কর্তা
মুক্তি দাতা দেব কীর্তিবাস,

সংসারে চলিল শিব
    করিবারে চাষ।
ভীমকে লয়ে সঙ্গে, পরম রঙ্গে
    ভোলা মহেশ্বর
দ্বাদশ বৎসর শিব, না আইল ঘরে।
    গলে তার হাড়ের মালা।৬৩

রামায়ণ কাহিনী এই গানের মুখ্য বিষয়। সীতাহরণের কাহিনীর পূর্বাভাস এই গানে স্থান লাভ করেছে।

আগে যায় রামচন্দ্র মধ্যে যায় জানকী
তাহার পিছনে যায়রে আমার লক্ষ্মণ সারথী।
এই ভাবেতে তিন জনাতে করিলেন গমন।
পঞ্চবটির বনে গিয়ে লক্ষ্মণ দিলেন দরশন।।
রাবণের বোন স্পর্ণনকাই ফুল তুলিবার যায়।
লক্ষ্মণ ঠাকুর ধরে তাহার কান চুল কেটে দেয়।।৬৪

—হাসপুকুর, নদীয়া।

রামের বিলাপ—
দেশে হারাই পিতা
    বনে হারাই সীতা,
রণে হারাই আমি—
    প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ।
উঠ উঠ ভাইরে লক্ষ্মণ
    ধুলা ভরে কেশে।
উঠে একবার দাদা বলে ডাকরে।
অভিমাতা যখন জিজ্ঞাসিবে
তুমি এলে রাম, লক্ষ্মন রইল কোথা?
কি জবাব দিব আমি
    দেশে গিয়ে অভিমাতাকে।
লক্ষ্মণের কথা শুনে
    অভিমাতা ত্যজিবে জীবন।৬৫

—হাসপুকুর। নদীয়া।

বর্তমান গানে মহাভারতের অভিমন্যুর কথা স্থান পেয়েছে।

আগম জেনে যুদ্ধে এলায়
নিগম নাহি জানি।
বাণ ছুটিল অবিরত
এ বাণ আর সহিব কত।
জীবন গেল বাণের আঘাতে।
আগম জেনে যুদ্ধে এলায়।
নিগম নাহি জানি।
বাণ ছুটিল অবিরত
এ বাণ আর সহিব কত।
অস্ত্র সৈন্য রণস্থলে।
অভিমন্যু কেঁদে বলে
জীবন গেলরে বাণেরই আঘাতে
কোথায় মাগো খেলার সাথী,
কোথায় ভগ্নী, কোথায় ভ্রাতা?
জীবন গেলরে, বাণের আঘাতে ॥**

—হাসপুকুর, নদীয়া।

আচার সঙ্গীত

পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় আদিবাসীর মধ্যে সাধারণতঃ করম পুজোর বিভিন্ন আচারে যে গান শুনতে পাওয়া যায় তাকে 'আচার সঙ্গীত' নাম দেওয়া যেতে পারে। এ-গানে রামকথায় অংশ গৌণ, তবুও লৌকিক 'রাম'কে পাওয়া যায় দৈনন্দিন জীবনের উৎসব আনন্দের দিনে।

করম পুজো উপলক্ষে গাওয়া এই আচার সঙ্গীতের বন্দনা গানে রাম কায় একাকার হয়ে গেছে।

পশ্চিমে বন্দিয়া গায়্ ক্ষীর নদী সাগর
যার জলে ভাইস্তা ফিরে সায় সদাগর।
উড়িষ্যা বন্দিয়া গায়্ ঠাকুর জগন্নাথ,
চণ্ডালে আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণে খায় ভাত।

ভত্রে আনিয়া জল থুইল বামুন বাড়ী,
লুইটা লুইটা খায় পরসাদ বলে, হরি হরি।
পুবেতে বসিয়া গায় যথা, উদয় ভানু,
দশরথের ঘরে জন্মিল রাম-কানু।
পূব উদয় ভানুরে পশ্চিমে যায় লন,
চাঁদ সুরুজ দুইটি ভাই কভু নহে ভিন্।৩৭

—মৈমনসিংহ।

করম সঙ্গীত

করম পুজো উপলক্ষে 'আচার-সঙ্গীতে' রামকথার কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এবার 'করম সঙ্গীতে' রামচন্দ্র মহীরাবণ ও হনুমানকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে। করম পুজোর উৎসব বর্ষাকালীন উৎসব। ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে এ-উৎসব প্রতিপালিত হয়। করম উৎসব আদিবাসীর জীবনে নৃত্যগীতের উৎসব। করম গাছের একটা ডাল নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা হয়। তারপর এই করম ডালকে ঘিরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। করম পুজোকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী পশ্চিম বাংলায় অনেক লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। করম উৎসব আদিবাসী হিন্দুর জীবনে এক বিরাট লৌকিক অনুষ্ঠান।

চারিদিকে চৌকি বসে
সকলে পালঙ্ক দেখে,
ওহো আহা কি রূপে নিয়ে গেল,
রামকে রাজা মহীরাবণকে।
শেতমাছি হয়ে হনু
আছে হনু পাতাল ভিতর,
আজ হনু দেখিবে এমন গো,
কেমন কালী দেখিবে এখন,
রাজাকা পুত্র আমি দণ্ডবত নাহি জানি,
ওগো দণ্ডবত করে দিও—
রামকে, রাজা মহীরাবণকে।৩৮

—বাঁশপাহাড়ী।

প্রশ্ন—কোন ঘাটে নায় হে রাজা দশরথ লাল
চিকন কালারে, কোন ঘাটে নামে হনুমান।
উত্তর—উপর ঘাটে নায় হে, রাজা দশরথ লাল,
চিকন কালারে নায় ঘাটে নামে হনুমান।[৩৮]

—বাঘপাহাড়ী।

গর্ভকালীন সঙ্গীত

'গর্ভকালীন সঙ্গীত' আর 'জন্মকালীন সঙ্গীতের' মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। শিশুর গর্ভবাসকালীন অবস্থার বর্ণনামূলক যে লোকসঙ্গীত পল্লী-বাংলার নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, সাধারণতঃ সেই সঙ্গীতকেই গর্ভকালীন সঙ্গীত বলা হয়। নিম্নের সঙ্গীতটি পূর্ব-মৈমনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এই সঙ্গীতকে 'গর্ভকালীন সঙ্গীত' না বলে 'জন্মকালীন সঙ্গীত' বলাই শ্রেয়।

"দশ মাস দশ দিন গো পূর্ণিত হইল।
সর্ব সুলক্ষণ শিশু গো ভূমিষ্ঠ হইল॥
সুবর্ণ কাটারীতে গো ধাই নাড়ী ছেদ করে।
ব্রাহ্মাদি পোকার করে গো কৌশল্যার মন্দিরে॥
দূত গিয়া বার্তা কইল গো দশরথের আগে।
হিরামণ মাণিক্য দিয়া গো রাজা পুত্র দেখে॥
সুগন্ধি চন্দন যত ছিটায় গো রাজপথে।
শিশু দেখতে রাজগণ গো আইল শত রথে।
নেতের পতাকা উড়ে গো প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিদান বাজভাণ্ড গো দেবের মন্দিরে॥
আম্রশাখে পূর্ণকুম্ভ গো তীর্থ জলে ভরি।
হুলাহুলি জুলাজুলি গো দেয় কুলনারী॥
যতেক নাটুয়াগণ করে গো নাচগান।
আনন্দেতে তোলপাড় গো করে পুরীধাম।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পুত্রসন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জনকগৃহে সীতার জন্মবৃত্তান্তই গীত হইবে। কিংবা এই সঙ্গীতটির মধ্যেও দশরথের নামের পরিবর্তে জনকের ও কৌশল্যার নামের পরিবর্তে জনক মহিষীর নাম যোগ করিয়া লইতে হইবে। বলাই বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই ভাবে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন উপলক্ষেও বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শ্রীরামের অন্নপ্রাশন ও উপনয়নের বিষয়ই অবলম্বন করা হয়। এই সকল সঙ্গীতে কোন উচ্চাঙ্গ কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পায় না।[৭০]

গ্রাম বাংলায় সভ্যতার আলো পরিপূর্ণ ভাবে পৌঁছতে পারেনি; অবসর বিনোদনের উপাদান সীমিত। গ্রামের মানুষ রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে তাদের আনন্দের খোরাক যোগায়। শিশুর জন্মকালটি শুভ মুহূর্ত। এই শুভ-মুহূর্তে বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের শুভ ঘটনা আবৃত্ত করে বাংলার নারী সমাজ শিশুর মঙ্গল কামনা করে। রামায়ণ-মহাভারত বাঙ্গালীর হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে মিশে আছে। এ-দুই কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে বাদ দিয়ে বাঙ্গালীর কোন শুভ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তাইতো দেখি 'গর্ভকালীন সঙ্গীতের' মধ্যে রামকথার প্রভাব।

জন্মকালীন সঙ্গীত

নবজাত শিশুর আবির্ভাব উপলক্ষে বাংলাদেশের মেয়েমহলে যে গান শুনতে পাওয়া যায়, তাকে 'জন্মকালীন সঙ্গীত' নাম দেওয়া হয়। শিশু জন্মালে পরিবারে একটা আনন্দের বান ডেকে যায়। হিন্দু পরিবারে রামচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে এ-গান রচিত হয়। কোথাও কোথাও লখিন্দরের জন্ম-কাহিনীও গীত হয়।

এই গানে মনসামঙ্গলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পরে সাধ খাইয়া সোনাইর—প্রসব বেদনা হইল।
রত্তি রত্তি বসে সোনাই ছাকিতে লাগিল॥
কোথা গেল ছয় বধূ দেখ গো আসিয়া।
বুড়া কালে প্রসব ব্যথা উপজিল বলিয়া॥
এক ঘাটে থেকে রাণী অন্য ঘাটে যায়।
মাঝের ঘাটে রাণী গড়াগড়ি খায়॥
রাম লক্ষ্মণ দুই শল আসিয়া উপজিল।
হস্তে যোড় লখিন্দর ভূমিষ্ঠ হইল॥
মাটিতে পড়িয়া ছেলে ওয়া ওয়া বলে।
হেনকালে দাই মা তুলে নিল কোলে॥
সোনার কাটারি দিয়া নাড়ী ছেদন করিল।
সোনার নপুরি কড়ি দাইরে দিল॥

ছয় দিনে লখিন্দরের ষষ্ঠ হইল।
সাত দিনে লখিন্দরের অশৌচ ঘুচিল॥
ছয় মাসের লখিন্দর হইল তখন।
শুভক্ষণে সোনাই করিলেক অন্নপ্রাশন॥
সোনাইর সঙ্গে যুক্তি করিয়া তখন।
রাখিল লখিন্দর নাম ওঝা বিচক্ষণ॥
দিনে দিনে বাড়ে লখাই মনসার বর।
সাত বৎসরের হইল কুমার লখিন্দর॥
শুভ দিন পাইয়া করাইল কর্ণভেদ।
রাজনীতি শিখাইল জানাইল বেদ॥[১১]

—মৈমনসিংহ।

রামায়ণ-মহাভারতের মত মনসামঙ্গল কাব্যখানিও বাঙ্গালার অন্তরাত্মার সঙ্গে মিশে আছে। রামায়ণ-মহাভারত বাঙ্গালীর জাতীয় মহাকাব্য, মনসামঙ্গলও বাঙালীর আত্মার আত্মীয়। রাম-লক্ষ্মণকে বাঙ্গালী ভুলতে পারে না, যদিও গ্রাম বাংলায় সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্ত বাঙ্গালী মা-মনসার আশীর্বাদ কামনা করে। 'জন্মকালীন সঙ্গীতে' আমরা মা-মনসার বর কামনার উল্লেখ পাই।

১—২. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৩. লোকসাহিত্যে ছড়া। মহম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী। বাংলা একাডেমীর পক্ষে ঢাকা। পৃঃ ১১৭।
৪. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। পৃঃ ১২১।

১—৫. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৫ম খণ্ড। ১৩৬৬।
৬. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড (আলোচনা) ৩য় সং। ১৩৬২। পৃঃ ২৫৫
৭. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড। ১৩৬৬। পৃঃ ৫১৯।
৮. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৩৫২) পৃঃ ৩০৬।
৯—১৪. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩য় খণ্ড। ১ম সং। ১৩৬৭।
১৫—১৮. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় ও ৩য় খণ্ড।
১৯—৩৩. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩য় খণ্ড। ১৩৬৭।
৩৪—৩৫. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড (আলোচনা)। ৩য় সং। ১৩৬২। পৃঃ ৩০৭
৩৬—৪০. বঙ্গীয়-লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ৩য় খণ্ড। ১৩৬৭।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের লোকসাহিত্য সংগ্রাহক চন্দ্রনাথ দে মৈমনসিংহ জেলায় লোককথা অবলম্বনে রচিত ছড়া—পাঁচালি ছন্দের এক ব্রতকথার সন্ধান পেয়েছেন। ডঃ সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার' (চতুর্থ খণ্ড) এই ব্রতকথার রূপান্তর মুদ্রিত হয়েছে। কবি বংশীদাসের বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী এই ব্রত-কথার রচনাকার।

৪—৩৮. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। (৩য় খণ্ড, ১৩৭৭)। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৩৯. বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদের শ্রীসুধাংশু ঘোষালের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৪০, ৪৩, ৬০. বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য। মণি বর্ধন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রচার-বিভাগ। ১৩৬১। পৃঃ ১৫২, ১৩৫।

৪১—৪২. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। ১৯৬২। পৃঃ ৩২৪। ৩১৯।

৪৭. সাহিত্য সমীক্ষা। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী। ১ম প্রকাশ ১৩৭৮। পৃঃ ৫২।

৪৪-৪৬, ৪৮-৫২. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় ও ৩য় খণ্ড।

৫৩—৫৯. হালপুকুর, নদীয়ার শ্রীমঙ্গল বিশ্বাসের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত।

৬১—৬৯. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭০. বাংলার লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। ১৯৬২। পৃঃ ৩০৪।

৭১. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। ২য় খণ্ড। ১ম প্রকাশ। ১৯৬৬। পৃঃ ৫১৩।

ঝাঁপান গান

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশেষতঃ পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে শ্রাবণ মাসে শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন কোন নির্দিষ্ট স্থানে সাপের ওঝা বা গুণিরা একত্রে মিলিত হয়ে জীবন্ত সাপ নিয়ে সমবেত কৌতূহলী জনসাধারণের সাক্ষাতে সাপের বিষ দূর করার কৌশল দেখিয়ে থাকে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন, "ঝাঁপান গানের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয় কাশ্যপমুনি স্বর্গের দেবতা। ভগবানের কৃপাবলে তিনি বহু তন্ত্রমন্ত্র পাইয়াছিলেন। একদিন মহাদেবের আদেশে কাশ্যপমুনি মর্ত্যধামে এই মন্ত্রাদি প্রচারে আসিবেন স্থির হইল। সেই সময় সুর-অসুর মিলিয়া সমুদ্রমন্থন করেন। কাশ্যপমুনি ঐ সময় সুধাপাত্র হাতে সমুদ্রে অধিষ্ঠিত হন, দেবতারা তাহা লইয়া স্বর্গে যান। পুনরায় তিনি মর্ত্তে আসেন। তখন তাঁহার নাম হয় ধন্বন্তরি। সেখানে আসিয়া তিনি ১২৬ জন শিষ্য তৈয়ারি করেন। তিনি ঐ শিষ্যদিগকে মনসাদেবীর জন্মকথা ও তৎসম্পর্কীয় নানা কাহিনী, সাপের মন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেন। তাঁহার প্রথম দুই শিষ্য—(১) সুষেণ, (২) সমান। ঐ সঙ্গে ঔষধস্বরূপ কিছু গাছের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। এই গাছগুলির নাম অস্থিসঞ্চারিনী, জীবসঞ্চারিনী, জ্যোতিরূপী, তেজোময়, বিশল্যকরণী প্রভৃতি। যাহারা এই মন্ত্র শিক্ষা করেন, তাঁহারা মনসাদেবীর অর্চনা করেন। তাই মনসা পূজার সময় ঝাঁপান গান হইয়া থাকে।"[১]

ঝাঁপান গানে রামায়ণের কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। এ-কাহিনীতে কেবল-মাত্র রাম বা সীতার উল্লেখ মাত্র থাকে না, রামকথা আখ্যায়িকার মত সুন্দর ভাবে গীত হয়। সীতাহরণের কাহিনী ঝাঁপান গানের মূল বিষয়বস্তু। বর্তমান সঙ্গীতটি মুর্শিদাবাদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

রাজা হবে রামচন্দ্র মনেতে ভাবিল।
কৈকেয়ী মধ্যপথে বাদ সেধেছিল॥
সাধ করে কৌশল্যা দিলেন গোচন্দনের ফোঁটা।
ভস্মর বলিতে রাম ধরিলেন জটা,
শিবের জটা ধরে রাম বনেতে চলিল।
পঞ্চবটীর বনে গিয়া উপনীত হইল।

পত্রেতে আর বিচিত্রেতে বাঁধিলেন কুটির।
ছল করিয়ে রাবণরাজ সীতা করে চুরি।
হা সীতা বলিয়া রাম লাগিল কাঁদিতে।
লক্ষণ বলে ওগো দাদা, প্রভু নারায়ণ,
সীতার লাগিয়া তুমি না করো ক্রন্দন ॥
আজ চুরি করিল সীতা লঙ্কার ঈশ্বর।
কিছুদিন পরে তাহার করিব উদ্ধার।
উপনীত হইল আসি কিষ্কিন্ধা আসিয়া ॥
এইখানকার রাজা ছিলেন বালি মহারাজ।
একে একে দিচ্ছি আমি তাহার পরিচয় ॥
তার ভাই সুগ্রীব ছিল বড়ই দিটালী।
রামের সঙ্গে তিনি পাতাইল মিতালী ॥
মিতালী পাতায়ে তখন সুগ্রীব মহাশয়।
রাজার নিকটে কুমন্ত্র দেয় কিছু তায় ॥
বালিরে বধিয়া সঙ্গে তখন মিতালি পাতাইল ॥
মৃত্যুশর বাণে রাবণ করিল নিধন।
মিতালী পাতায় তখন প্রভু নারায়ণ ॥
করিয়া তিনি অযোধ্যার পতি,
সীতারে লইয়া তিনি করেন বসতি ॥২

এই গানেও সীতাহরণের কাহিনী পাওয়া গেছে। সূর্পণখার চরিত্র, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার পতিভক্তি, সর্বশেষে জটায়ুর আত্মত্যাগ। এ গানে তরজার মত বিপক্ষ দলকে উত্তর দিতে সুযোগ দিয়ে গায়ক তাঁর গান অসমাপ্ত রাখেন।

রাবণ যাস নে গো কভু যান পঞ্চবটীতে।
সীতা দেবীর রূপ দেখিলে পারবি নে ভুলিতে ॥
সেখানে আছে দুজন জটাধারী
তাদের আছে সুন্দরী নারী ॥
তারা আছে বনেতে।
সূর্পণখা বলে, দাদা, শীঘ্র করে যাওগে সেথা।
নাক কান কেটেছে আমার নাহিক মনেতে ॥
শুনে সূর্পণখার কথা মারীচকে ডেকে বলে তথা,
মায়ামৃগ হওগো তুমি পঞ্চবটীতে।

মারীচ চলিল বনে রাম লক্ষ্মণ আছে যেখানে,
মায়ামৃগ হয়ে তখন চলিল ধেয়ে ॥
মায়ামৃগ ধরিতে রাম বনে প্রবেশিল তখন,
'লক্ষ্মণ' 'লক্ষ্মণ' বলে মৃগ ডাক দিল তিনটে।
ডাক শুনে সীতাদেবী বলে,—লক্ষ্মণ,
তোমার দাদা পড়েছে বিপদে, যাওনা তুমি বনে।
সীতাদেবীর কথা শুনে লক্ষ্মণ বনেতে চলিল।
যোগীবেশে রাবণ এসে রথ লাগাইল।
সীতাদেবী গোলকের বাইরে এলে
রাবণ তাকে তুলে নিলে।
নদীর তীরে জটায়ু যে ছিল,
তার সঙ্গে শুনো রাবণের লড়াই হল।
রাবণের ছোরার আঘাতে জটায়ু মরিল।
সীতাকে নিয়ে রাবণ তীর বেগে লঙ্কা ছুটিল।
এইখান থেকে সাঙ্গ করি
করবো নাক দেরী।
বিরুদ্ধ পার্টি কি বলিছে শুনিবে দশেতে ॥[৩]

ঢেঁকি-মঙ্গলা

নারদ মহাভারতের এক বিশিষ্ট চরিত্র। নারদের বাহন ঢেঁকি নিয়ে বাংলা লোকসাহিত্যে কিছু গান রচিত হয়েছে। ঢেঁকিতে সাধারণতঃ মেয়েরাই ধান ভানে। ঢেঁকিকে কেন্দ্র করে যে গান গীত হয়, সচরাচর তা মেয়েরাই গায়। রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম-ঠাকুরের পূজার বিশেষ প্রচলন আছে। পূজার ধান ঢেঁকিতে ভানা হয়। ঢেঁকি তাই পবিত্র। এই পূজা উপলক্ষে ঢেঁকিতে যখন ধান ভানা হয়, তখন মেয়েদের যে আচারসঙ্গীত গীত হয়, তাকেই ঢেঁকি-মঙ্গলা বলে। বর্তমান গানে নারদ ছাড়াও মহাভারতের গন্ধর্ব এই নামের আবির্ভাব ঘটেছে।

কৌতুকেত দেবগণ করিতে মঙ্গল গান
বসিলা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর।
তেত্রিশ কোটি দেব বসিলেন সব
গন্ধর্ব-কিন্নর ॥

পণ্ডিত চারি জনে আনন্দিত পুর মনে
দ্বাদশ ভকত আনি।
মুক্তাহার ধান্য আনি, মুকুতা প্রধান মণি
দুর্লভ জগতে বাখানি॥
কোটাল চারিজন আদেশে দেবগনে
নারদে আনহ ত্বরা পতি।
চলিল অতঃপর মুনি বরাবর
কহিল দেবর ভারতী॥[৫]

—বাঁকুড়া।

ঢেঁকি বরণের গান

ধর্ম ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় মেয়েদের আচারসঙ্গীতের মধ্যে যেমন 'ঢেঁকি-মঙ্গলা গান' শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি মৈমনসিংহ জেলায় হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়েদের এক শ্রেণীর আচারসঙ্গীতকে বলা হয় 'ঢেঁকি-বরণের গান'। ঢেঁকিতে মেয়েদের মঙ্গল দ্রব্য যথা হলুদ ইত্যাদি কোটা হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে ঢেঁকির প্রশস্তি করে কীর্তনের ঢঙে মেয়েরা গান গেয়ে থাকে। এখানেও নারদের কথার উল্লেখ থাকে। তাছাড়াও মহাভারতের অন্য চরিত্রের সঙ্গে রামায়ণের কৌশল্যা চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। রামায়ণের রামের জননী কৌশল্যা এক বিশেষ নারী চরিত্র। সুতরাং কৌশল্যার উল্লেখ বহু লোকসঙ্গীতে স্থান গ্রহণ করেছে।

(১) এ নারদ মুনি কি কি দ্রব্য লাগে।
তেল লাগে সিন্দুর লাগে লাগে গুয়া পান।
আর লাগে নারদ মুনির দূর্বা আর ধান।[৬]

—মৈমনসিংহ।

(২) সুমন্ত্রের বাণী শুনে রাজরাণী।
বলিলেন তবা কৌশল্যা গো রাণী॥
আনো এয়োগণ বত ছানার সন্দেশ গুড়।
তেল সিন্দুর দিয়ে ধান্য আনে রাণী॥[৭]

—মৈমনসিংহ।

চাষের গান

বাংলা দেশে কৃষকের প্রধান অবলম্বন চাষ। চাষ করার সময় তারা গান গায়। এ গানকে কর্ম-সঙ্গীতের অন্তর্ভু'ক্ত করা চলে। বর্তমান গানটি চাষ-কথা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

জনম-দুখিনী সীতার কথা এ-গানে বলা হয়েছে।

আমার কাঁদিতে কাঁদিতে গো জনম গেল,
পলাশের পাতা যেন যুগল না হল।
সত্যযুগে লক্ষীরূপে ছিলাম আমি
বৈকুণ্ঠেতে গো,
হেনকালে প্রভুর আমার কি ভাব হইল।
ত্রেতাতে স্বামীর সাথে গিয়েছিলাম
বনবাসে গো।
ভাগ্য দোষে রাক্ষস এসে আমারে হরিল।[৭]

—বেলপাহাড়ী।

পাঁচালি মহাভারত

রামায়ণের মত লৌকিক ভারত-পাঁচালি গ্রামবাংলায় আজও গীত হয়। ভারতকথার বিভিন্ন কাহিনীর লৌকিক রূপায়ণ এই সব পাঁচালি গানে শুনতে পাওয়া যায়। ভারতকথার বিভিন্ন কাহিনী নিরক্ষর পল্লীকবির কণ্ঠে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে।

নদীয়ার বোলান গানে যাত্রায় ঢংএ এ-পাঁচালি গীত হয়।

সাবিত্রী সত্যবান পালার পাঁচালি

সতী— পতি ভিক্ষা দাও আমারে
পতি ভিক্ষা দাও গো।
হে মৃত্যুঞ্জয় পায়ে ধরি
একবার ফিরে চাও গো॥
তোমার হাতে থাকতে খেলা,
কেন স্বামী লয়ে করছ ছলা।
জেলে দিয়ে মদন জ্বালা।
কোথা লয়ে যাও গো।

ধর্ম— প্রাণ ত্যেজিলে তোমার পতি
কাঁদলে কি আর পাবে সতী ?
মরণ পথে যাহার পতি—
চাইলে কি আর পাও গো ।।

সতী— থাকতে আমার প্রেম পিয়াসা
করগো কেন নৈরাশা ।
দাও মৃত্যুঞ্জয় ভালবাসা
বাসনা পুরাও গো ।।

ধর্ম— যাও জননী, যাও মা ঘরে,
পতি পাবি না মা বলি তোরে ।
আসবে যদি, যাবে কেন
ভেবে দেখ মনে,
আসা যাওয়া দেবের খেলা
এ সকল কারণ গুণে ।।
চিত্রগুপ্তের হাতে দপ্তর
খাতাখানি সহি করে,
সমন খানি সই করিয়ে
নন্দীকে দিলে দ্বারে ।
এভার আমার নাই মা হাতে
তুমি বর চাও মা, পারি দিতে,
যাতে সুখী হও গো ।
যাও জননী যাও মা ঘরে
আর আসিস না পাছু, ধরে ।
বর মাগো মা দিব তোরে—
যাতে সুখী হও গো ।

সতী— যদি দয়া হল মোরে এখন যাব
আমি অন্ধের ঘরে,
অন্ধের জীবন হয় সত্যবান
তারে নিল কেড়ে ।।
পতি ছেড়ে কেমন করে যাব আমি ঘরে
রাজ্য দানে চক্ষুদানে শ্বশুরে কর সুখী ।

পতিহীনা নারী আমি হলাম চিরদুখী,
রূপের ডালি, রসের কলি কারে আমি দিব,
সত্যবান বিনে জ্বালা কেমনে নিভাব।
যদি তুমি হও দয়াময়, আমি বলি তোমায়
হে মৃত্যুঞ্জয়।"

বোলান গান

রামকথা

পালা

অযোধ্যাতে রাম রাজা হয়। প্রজাগণ সকলে করে জয় জয়।
সীতা সঙ্গে নানা রঙ্গে, সুখেতে রাম দিন কাটায়॥
জানকী কহিছে শ্রীরামের কাছে, যখন ছিলাম লঙ্কাতে।
লঙ্কায় রাবণ, আমারে তখন রাখে অশোক বনেতে।
আমি কাঁদিতাম, আর বলিতাম, যদি দেশে যাই।
যদি প্রভু দয়া করে। আমারে উদ্ধার করে। গিয়ে অযোধ্যায়॥
এমনি রতন, অশোক কানন, প্রাণনাথে বলিয়ে করা চায়।
সীতার কথায়, প্রভু তাই, অশোককানন অযোধ্যায় বানায়॥
রাম সীতা দুইজনেতে অশোক কাননেতে যাই।
আনন্দেতে সীতার সঙ্গে নিরানন্দ তাদের নাই॥
বিধির ঘটনা কে খণ্ডাইতে পারে।
স্নান করিতে গেল শ্রীরাম সরযূর নীরে॥
রাত্রিকালে পিত্রালয়ে রজকিনী যায় চলে।
ফিরে দিতে এসে রজক তাহার শশুরে বলে।
রাবণের ঘরে সীতাদেবী ছিল, রামচন্দ্র আনিল তায়।
মনে কি ভেবেছো তাই দিতে এসেছো।
আমি তো নেব না হায়॥
ওগো, সেই কথা শুনে শ্রীরাম ভবনেতে যায়।
অযোধ্যাতে প্রজাগণ ওকথা জনে জনে বলিছে সবায়॥
এখানেতে সখীর সাথে, সীতাদেবী কত কথা কয়।

বল সীতা লঙ্কায় রাবণ, বটে কেমন, কি মুরতি হয় ॥
নয়নে দেখি নাই তারে, অনেক দিন লঙ্কাতে ছিলাম।
রাবণের রথ হইতে জলেতে ছায়া দেখিলাম ॥
দশাননের দশটি বদন দেখিব নয়নে।
অঙ্কিত করিয়া ধনী দেখাও গো এক্ষণে ॥
ধরাতে আঁকিল ছবি, দেখিলা সবে ঘরে যায়।
পাতিয়া নেত্রের বসন শয়ন করিল ধরায় ॥
রাবণের ছবি, মূর্চ্ছা নাই হোল ঘুমে হল অচেতন।
এমন সময়ে স্নান করিয়া শ্রীরামের আগমন ॥
এসে দেখে রাম সীতাদেবী, শয়নে আছে।
শ্রীরাম ভাবিছে।
সীতা কুল কলঙ্কিনী, অযোধ্যাতে হায়।
রাখবো না সীতারে আজি, দিব বনে, বিদায় করা চায় ॥
ফিরে এসে লক্ষ্মণেরে বলে শ্রীরাম ধীরে ধীরে।
ভাইরে লক্ষ্মণ, শুন শ্রবণ, রাখবো না আর সীতা ঘরে ॥
যতন করে ভুজঙ্গিনী ঘরেতে রাখিলাম।
বন বাসে দিব সীতায়, চরিত্র বুঝিলাম ॥
উহু আমি মরি মরি, বাঁচি না পরাণে।
মনের কথা প্রাণের ব্যথা, তুই বিনে আর কে জানে ॥
বারে বারে ভাই বিলম্বে কাজ নাই রাখিয়া সীতারে।
সীতা কলঙ্কিনী, কাল ভুজঙ্গিনী দংশিল আমারে ॥
আমি চিরদিন তোমার আজ্ঞা, করেছি পালন।
তোমার আজ্ঞা শিরে ধরি লয়ে যাব
তোমার স্ত্রী নিবিড় কানন ॥
এই খানেতে বোলান আমি, আমরা আজ সাঙ্গ করে যাই।
সাটুই গ্রামেতে বাড়ী, বসত করি, আমরাগো সবাই ॥
রাম কানু দলপতি, হাবল চন্দ্র সহকারী।
ক্ষুদিরাম যে বাজাচ্ছে ঢোল, ভোলানাথ দিচ্ছে জুড়ি ॥
পড়ায়ের বাতিক ভারী, দলে সে মিশে না।
পোড়া ডাঙ্গার হরিচরণ, গান করে রচনা ॥
লক্ষ্মণ, কি বলিলে, কি শুনালে, ওহে রাম গুণমণি।

বিনা মেঘে আমার মাথায় পড়িল যে অশনি ॥
এত যদি ছিল মনে, সীতা উদ্ধার করিলে কেনে।
কি দোষে রাম দেবে বনে। সেই কথা বল শুনি ॥
যার লাগি লঙ্কাতে গেলাম, শক্তিশেল বুকে বিন্ধিলাম।
যার লাগি সাগর বাঁধিলাম, গলায় গড়াই কালফণি ॥
বনে দেবে এমন সীতে, বল শ্রীরাম কি দোষেতে।
আমি নয়নের জলেতে, ভাসবো দিবা যামিনী।[৯]

অরণ্যকাণ্ড

[রামায়ণের 'অরণ্যকাণ্ড'—বোলান গানের এই পালা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রথম কলিতে সরস্বতীর বন্দনাগান গাওয়া হয়। বন্দনাগান শেষ হলে পর মূল পালা শুরু হয়।]

কলি : (১) বলে শূর্পণখা হও হে লক্ষ্মণ সখা কহে,
মুচকী হেসে প্রেমের কথা শেষে বলিল।
বলিল, হও হে আমার পতি, কর আমার গতি,
করিতো মিনতি বলিতে যুবতীর
প্রেম চলিল।

(২) ফিরে যাওহে লক্ষ্মণ বলি তোমারে,
তা নইলে সবশেষে পড়িবু ফেরে।
সঙ্গেতে আছে নারী, লজ্জায় আমি মরি,
সহচরী লঙ্কাতে যাও হে ফিরে ॥

(৩) মোর মিনতি তুমি রাখ লক্ষ্মণ, প্রেম যৌবন
জ্বালায়ে পায় বেদনা,
মারি বন্দুকে টান, কাটিলাম শূর্পণখার কান।
বাণে গো কাননে শূর্পণখার ॥

(৪) চিৎকার চলিতে লাগিল কাঁদিছে অবিরত,
বধিরে বসন ভিজে যায়।
লঙ্কাতে আমি যাব দশাননে চেনা,
সাজা দেবে গো তোমায় ॥[১০]

লব-কুশ ও শ্রীরামের যুদ্ধ

এই বোলান গানটিতে রামায়ণের লৌকিক রূপায়ণ এক বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয়। রামকথা ও ভারতকথাই বোলান গানের বৈশিষ্ট্য। এ গানে সে বৈশিষ্ট্য হিন্দি ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে রূপায়িত। আদিবাসী সাঁওতালদের মধ্যে এ গান সাঁওতালী সুরে পরিবেশিত হয়। একদিন পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষ নদীয়া জেলায় জলঙ্গী নদীর চরে বাসা বেঁধেছিল। আজ তারা বাংলার সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে। সংহত সমাজব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছে। তার নিদর্শন সাঁওতালী সুরে রামকথার এক বিশেষ দিক তুলে ধরেছে অপূর্ব ছন্দমাধুর্যে :

বন্দনা

কলি : (১) এসো গো মা বীণাপাণি প্রণাম শ্রীচরণে।
কণ্ঠে বসে বলাও বাণী মধুর বচনে॥

(২) যোগীন্দ্র যোগাসনে পায় না ধ্যানে স্মৃতি।
আমরা গো করি আরতি।
আমরা গো করি আরতি॥
সারদা বরদা তুমি গো,
অজ্ঞানে কর গতি।
অজ্ঞানে কর গতি॥

(৩) দয়া ভি করকে দিয়া আয়া।
দেবী অভয়া॥

(৪) তুঁহী ছাড়া, এ মাইজী।
কুছ নেহী জান॥
হামার এ আসরমে করগো করুণা॥

(৫) লেড়কা মেরা ডাকিতের
প্রণাম লে তুহো, জী হ' মাঁয়া।
সীতারূলে, মাইজী তুই হামারা।
ডাকি ডাকি তুমসে মেরা॥

(৬) ভুলনা ভুলনা আমার মনের মনুয়া।
ভুলনা ভুলনা আমার মন
শেষের দিনে,
সেজন দিনে।
সে জন বিনে কে হবে তোর আপন।
ভুলনা ভুলনা আমার মন।।

(৭) বলি তাই (বারে বারে) মন আমার ভুলনারে।
ইন্দ্রিয় মাঝে করব স্মরণ।
নয়ন জলে না ধোয়ালে
কেমন করে পাব আজ গো—
তোমারই চরণ।।[১১]

ঘোলান গান

ভারতকথা : রাজা হরিশ্চন্দ্র পালা

(১) মনে জাগিয়াছ তুমি, জগতে ভ্রমি আমি
মনের আঁধার গেল না গো দেখা নাই পাই।
রহিয়াছে লুকায়ে কে দেবে দেখাইয়ে
এ জনম অকারণ বহিয়া যায়।।
আমোদে মাতিয়া ভবে লইতে তোমারি নাম,
শান্তি পেতে ভ্রান্তি এসে জড়িত হয়েছে কাম।
মরুময় হৃদয়েতে আপনার মহিমাতে
আসিয়া হবে বসিতে মিনতি গো তাই।।

(২) জীবন ফুরায়ে গেল, আয়ু সূর্য অস্ত যায়,
ঘোর অন্ধকার এলো, কি এখন উপায়।
কোথা পাব ধন, বিভিন্ন রতন, কোথা পাব কামিনী।
দিবস রজনী, গেল এই গণি, আর কিছু না জানি।।
যাদের লাগি ভেবে মরি তারা কিগো আমার হবে।
যাবার দিনে কেও কারো নয় একা চলে যেতে হবে।।
ওগো মরণে স্মরণে, বড় ভয় মনে,
সেই দিনে আর তো কেহ নাই।

অসময়ে তাই ডাকি, হে হরি, চরণে
আমায় পারে যাবার সময় হলো হে—
নিয়ে যেতে ভুলোনা ॥[১২]

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

বন্দনা

(১) আঁধারে হেঁসে হেঁসে কমল করে বীণা ধরে।
বাজাও মা মোহন স্বরে
দেখবো ওরূপ নয়ন ভোরে ॥

(২) আশা যে বড় অন্তরে মা দয়া করে।
পূজিব চরণ দুটি, দিয়ে এই নয়ন দুটি।
এসো মা এই আঁধার ঘরে।

(৩) এসো মা বাগ্বাদিনী, আপনার মনে।
ভজন সাধন জানি না মা দেখ চরণে ॥

(৪) এসো এসো দেখি মা বসে আমার কণ্ঠাসনে।
কি বলে ডাকিব, কোন ফুলে পূজিব
বনাও বাণী নিজগুণে।

(৫) পেতে আসন খানি বসে আছি আশাতে।
মাগো তোমার আশাতে।
ও নাম শুনে ডাকি, দিসনা ফাঁকি,
হবে আসিতে, মাগো তোমার আশাতে ॥

(৬) দেখলে তোমার হাসি মুখটি
সকল দুঃখটি দূরে যায়।
ভক্তি অনুরাগে, আঁখি জেলে দেব
রাঙ্গা পায় ॥[১৩]

ঝুমুর : রামলীলা

আমার কাঁদিতে ভাবিতে গো জনম গেল।
পলাশের পত্র যেন যুগল না হল ॥
সত্য যুগের লক্ষীরূপে ছিলাম বৈকুণ্ঠেতে গো।
হেনকালে প্রভু আমারে কি ভাব হইল।

ত্রেতাতে স্বামীর সাথে গিয়েছিলাম বনবাসে গো।
ভাগ্য দোষে রাক্ষস এসে আমারে হরিল॥
দ্বাপরে বাঁশরীর সুরে মন আমার নিল হরে গো।
অবশেষে অক্রুর এসে আমার বঁধুরে হরিল॥
কলিকালে নীলাচলে ছিলাম প্রভুর চরণ তলে গো।
সুখের দিনে প্রভু আমার সন্ন্যাসী সাজিল॥
চারি যুগে ঘুরি তবু দয়া কেন না হয় ভাবি গো।
রাঙ্গা চরণ পূজিব বলে আশা ছিল॥[14]

—বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর।

বিশ্বামিত্র মুনি লয়ে লক্ষ্মণ ধন রঘুমণি।
চলিলেন মিথিলার পথে॥
হায়, কি হইল অযোধ্যাতে।
দ্বাদশ বৎসর রাম যায় রাক্ষস মারিতে।
তাড়কা মরিল বনে শ্রীরামের ব্রহ্ম বাণে।
রাক্ষস মারিল রঘুনাথে॥
গৌতম মুনির শাপেতে অহল্যা ছিল পাথরেতে।
পাষাণ মানব হল চরণ ধূলিতে,
তাড়কার কোঙর মারীচ নাম ধরে,
বাণ খেয়ে পালায় লঙ্কাতে॥
সীতার বিবাহ তরে হরধনু ভঙ্গ করে।
শিব ধনু ভাঙ্গিল হেলাতে॥
শ্রীরামের ভ্রমণ রচিলেন নিধিরাম।
প্রণমিয়া ও পদ পূজে॥[15]

—হাতিবাড়ী, মেদিনীপুর

ঝুমুর ঃ ভারত-পালা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ঝুমুর—ভারত-পালার প্রধান বিষয়বস্তু। আখ্যানমূলক পাঁচালির আকারে রচিত ও গীত এই সব ঝুমুর-গানে ভাবের আধিক্য নেই। ভারতকথা আদিবাসী মানুষের মনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে, মহাভারতের বিভিন্ন অংশ কিভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা

এইসব ঝুমুর গানে উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণ-অর্জুন কাহিনী যে গানে রূপ লাভ করেছে, সে ঝুমুর গানকে আদিবাসী গ্রাম্য মানুষ নাম দিয়েছে, 'অর্জুন-পালা'। অর্জুন-পালায় বেশীর ভাগ গানই দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে রচিত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিছেন বাণী, শুন শুন রাধারাণী,
বলিহে হে তোমায়।
ও যে যাজ্ঞসেনীর কেশ ধরি আনিল সভায়,
সখা, বল ভাই সে দিন তার ছিল গো কোথায়?
দুষ্ট দুঃশাসন বসনে ধরিয়া টান,
তখন বড় লজ্জা পায়,
তোরা সেদিন ছিলে হে সবাই বলো ভাই,
সেদিন তার ছিল গো কোথায়?
জতুগৃহ নির্মায়ে তাহাতে আশ্রয় দিলে,
অনলময় জ্বালা।
পঞ্চজন সেদিন তোরা ছিলে হে সবাই॥
কেশ ধরে টানিল দুঃশাসন,
আর কত অপমান,
সভা মাঝে করিল।[20]

—বাঁশপাহাড়ী।

থাকতে স্বামী পঞ্চজনে বস্ত্র টানে দুঃশাসনে
উলঙ্গ করিতে।
কেমন করে দুঃশাসনে টানিবে বসন
দয়াময় নারায়ণ।
সত্যভামা রুক্মিণী পাশে
হরি বসে ছিলেন এক-আসনে,
জানিতে পারিল,
কত অপরাধ করে সভার ভিতর
দয়া কর নারায়ণ।
গরুড়ের পিঠে চড়ে হস্তিনাতে এলেন হরি
তরাতে দ্রৌপদী।
তাই ধর্মরক্ষা লাগি আলেন ঈশ্বর
দয়া কর নারায়ণ।[21]

—বেলপাহাড়ী।

ঝুমুর ঃ দাঁড়-শালিয়া

নৃত্য-গীত সহযোগে আদিবাসী এলাকার পুরুষের আর এক শ্রেণীর লোক-নৃত্যের নাম 'ঝুমুর-দাঁড়-শালিয়া'। মাদল ধামসা সহযোগে পুরুষের দল এ গান গায়। ধামসার শব্দে গানের অনেক কথা শোনা যায় না।

এ গানে রামকথার সীতাহরণের কাহিনীই মুখ্য। রাবণের যোগীবেশ, জটায়ু পাখীর আত্মত্যাগ এই গানের বর্ণিত বিষয়।

আইল রাবণ রাজা যোগীবেশ হয়েছে।
দুয়ারে দুয়ারে রাবণ ভিক্ষা মাগিছে।
দুয়ারে দুয়ারে রাবণ ভিক্ষা করিছে।
হাতে হাতে ভিক্ষা দিতে হাত ধরিলরে।
হাতে ধরি রাবণ রথে চড়াইলরে।
কোথা ছিল জটাপাখী রথ ঠেকাইলরে।
পাও ভাঙ্গিল জটার, ডানা ভাঙ্গিলরে।
পড়িল জটার দেহ পর্বত সমানরে।
হেন হনুমা বলে, ইকথা মিথ্যা নয়,
পড়িল জটার দেহ পর্বত সমানরে॥[১৮]

—পচাপানি।

এখানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা সীতার বেদনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। রাধাবিরহী, সীতা রামচন্দ্রের অদর্শনে কদম্বের তলে রোদন করে, আর হনু কান্দে কদম্বের ডালে।

কেউ কান্দে হাটে বাটে।
কেউ কান্দে পুকুর ঘাটে, দিল নাই বাঁধে।
কেউ কান্দে কদমের তলে, গো রাধে॥
লক্ষণ কান্দে হাটে বাটে।
রাম কান্দে পুকুর ঘাটে, দিল নাই বাঁধে।
সীতা কান্দে কদমের তলে গো রাধে।
হনু কান্দে কদমের ডালে গো রাধে।
দিল নাই বাঁধে॥ [১৯]

—পচাপানি।

আখ্যান সঙ্গীত

ঠাকুর বলে—
আজ কেনে দেখি ভীম, তোমার বিরস বদন।
আজ কিছু করেছিলাম রন্ধন ভোজন।
রন্ধন ভোজন কালে সামগ্রী দিলে কি?
সালিয়া কলাই সালিয়া বেগুন কন্দ কুড়ি কুড়ি।
মন পাঁচিসেক দিয়াছেন কাল মরিচের গুঁড়ি।
বাহার মন চাল দেয়, তের পৌটি ডাল।
সাত কলসী ঘৃত দেয়, লবন মন চার।
শিব নিন্দা করো না, শিবের কর সেবা।
শিব দিতে পারে বর ধনে করে রাজা।
শিবের নিন্দা ক'রে দক্ষ অজা মুখো হলো।
রামের মারে রাবণ রাজা নির্বংশ হলো।[২০]

—বীরভূম।

উপরিউক্ত আখ্যান-সঙ্গীতের 'ভীম' সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভীম মৌল উৎসের লৌকিক দেবতা, এবং কৃষি অনুষঙ্গেই তার বিশিষ্ট বিকাশ বলে মনে হয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত মেদিনীপুরের যে মৃত্তিকায় বিভিন্ন সংস্কৃতির ঘাতপ্রতিঘাত ও মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে তার পটভূমিকায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ভীম পুজোর আদিম উৎসে হয়ত আদিমতম বিশ্বাস অনুষ্ঠানের উত্তরাধিকার উদ্ঘাটন করা সম্ভব। পৌরাণিক ধর্ম প্রভাবে আদিম লৌকিক ভীমকে মধ্যম পাণ্ডব রূপে চিহ্নিত করলেও লোকায়ত সমাজে ভীম মূলতঃ চাষী। লোকপ্রচলিত বিভিন্ন কিংবদন্তীর সূত্রে দেখা যায়, ভীমের প্রধান কাজ কৃষিকর্ম এবং লোকায়ত সমাজে ভীমের বিশেষ পরিচয়—খেত্রী, চাষী হালুয়া, কৃষিকর্মের মুনিশ। অবশ্য উক্ত সমাজের প্রভাবে শিষ্ট সাহিত্যে কৃষি অনুষঙ্গে ভীম শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক। মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের সাক্ষ্যে দেখা যায়, ভীম শিবের কৃষি কর্মের মুনিশ, হালা', কবি রামেশ্বরের শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যের লৌকিক খণ্ডে দেখা যায়, পার্বতীর পরামর্শে শিব দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারের অচলাবস্থা দূর করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে কৃষি-কর্মের পাট্টা সংগ্রহ করেন, শূলভঙ্গে হাল প্রস্তুত করেন এবং কৃষিকর্মের জন্য

কৈলাস ত্যাগ করে দেবীচকে যান, সঙ্গে চলেন শিবের কৃষিকর্মের প্রধান সহায়ক প্রধান হালুয়া ভীম—

ভীম আছে হালুয়া আর অনির্বাহ কি
হর বলে চল কৈলে হেমন্তের ঝি ॥২১

মহাভারতের ভীম আর লৌকিক ভীম এক নয়। মধ্যম পাণ্ডব ভীম এখানে কর্মের দেবতা। লৌকিক দেবতা ভীমের কোন বাহুবল নেই। প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী সে নয়, একমাত্র ভোজনবিলাসী হিসাবেই লৌকিক ভীমের পরিচয়। শিব-সংকীর্তন বা শিবায়ন কাব্যে ভীমের চরিত্র শিবের কৃষিকর্মের মুনিশ হিসাবে চিত্রিত। লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে স্মার্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলন এই চরিত্র চিত্রণে রূপলাভ করেছে। এই পৌরাণিক 'আখ্যান সঙ্গীতে' ভীমের চরিত্র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-কথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রাজধারী পালা

উত্তর বঙ্গে বিশেষ করে 'খড়িবাড়ী' অঞ্চলে এক শ্রেণীর পালা গানের বিশেষ প্রচলন আছে, এ গানকে 'রাজধারী পালা' বলে। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ আর পৌষ মাসে এ গানের আসর জমে। রাজধারী পালা বেশ বড়। রামায়ণের রামচন্দ্রের জন্ম ও বনবাস থেকে শুরু করে রাবণ বধ পর্যন্ত এ পালায় গাওয়া হয়। কখনও কখনও দু রাত্রি ও পরের দিনও পালা গান চলে। উত্তর বঙ্গে লোককবির এ পালা গান একত্রিত করলে একখণ্ড সংক্ষিপ্ত রামায়ণ সৃষ্টি হতে পারে।

...ভাইরে লক্ষ্মণ, গাছের বাকল পইরে পইরে
হে দেশে দেশে হে ভ্রমন করিবে ভাই।২২

রুমাল নৃত্য

গড়বেতা অঞ্চলে 'রুমাল নৃত্য' নামে এক প্রকারের নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান চোখে পড়ে। গ্রাম্য যুবকেরা যুবতীর বেশে ঘাগরা পরে নাচের সময়ে রুমাল ব্যবহার করে।

এই নৃত্যে যে গান গীত হয় সে গানে পঞ্চবটী বনে রামের বনবাস অংশ সাধারণতঃ গাওয়া হয়। পল্লী-কবির কণ্ঠে রামকথা 'রুমাল নৃত্যে' পরিবেশিত হয়। বৈচিত্র্যের দিক থেকে এ নৃত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'রুমাল নৃত্যে' সঙ্গীত গৌণ, নৃত্যই মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকে।

পঞ্চবটীর বনে রাম বাঁধলে কুঁড়েখানি।
কাল হয়ে এল রামকে সোনার হরিণী,
মৃগ ধরে দাও বলে জনক নন্দিনী,
ওগো ধরতে না পারি আমি
মেরে দিব আনি।[২৩]

যুবতীদের সমবেত কণ্ঠে গান

আমার হিয়া বড় দশা গো,
আমি চুল বাঁধব কিসে?
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই নয়নের তারা,
আবার বনে বনে ঘু রছে হলাম।
সীতা হারা হলাম গো।
চুল বাঁধব কি-সে?[২৪]

—কেন্দুয়া।

রামায়ণ গান

পল্লী-কবিদের এই গান আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়—সংস্কৃতে, পালিতে ও প্রাকৃতে। ভারতের বাইরেও রামকথার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। পল্লী-কবিরা এই প্রাচীন সাহিত্য গানে, কথকথার মাধ্যমে আমাদের ঘরের সামগ্রী করে তুলেছেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অংশে উৎসবে, পাল-পার্বণে, অন্নপ্রাশনে, শ্রাদ্ধবাসরে এ-গান কীর্তনের মত গীত হয়ে থাকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বিশেষ যেমন এই সব গানে গীত হয়, তেমনি আবার বিভিন্ন লোক-কবির রচিত 'রামায়ণ গান' গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অংশে শুনতে পাওয়া যায়। লোক-কবি রচিত এই সব গানে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব রামায়ণ-গানে প্রস্তাবনা দেব ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে গীত হয়। 'বন্দে অহং শ্রীগুরু শুভ পদ কমলং'। দোহারীরা গান গায় কীর্তনের সুরে। বিভিন্ন রামায়ণ থেকে অংশ বিশেষ গ্রহণ করে পল্লী-কবিরা নতুন রামায়ণ গান রচনা করেন। নৃত্যবিদ শ্রীমণি বর্ধন বলেন, "বীর ভানপুরের প্রহলাদ দত্ত, ষষ্ঠ গদা গ্রামের শ্রীরাম পদ কাল গিরি, বিনোদ ধর, চন্দ্রকোনা রোডের গোবর্ধন ঘোষালের গাইয়ে হিসাবে খ্যাতি আছে।"[২৫]

দোহারীরা কীর্তনের সুরে গায়—

রাম এসো হে—
জানকীর সনে, একবার এসো হে
দুটি চরণ বন্দিব, একবার এসো হে
(ও রাম) জানকীরে লয়ে—
রাম, হৃদয় পদ্মাসনে একবার এসো হে।

তারপর মূল গায়েন মন-শিক্ষার গান গায়—

মন তুমি কার, কে তোমার
কার চক্ষে বা ভাব হে
ঘর দরজা, বালা খানা, পাজাকরের বাজীরে।

তারপর মার্জিত ভাষায় শ্রীরামের রূপ বর্ণনা :

নব ঘন নবীন, নীরদনীল নিন্দিত
ও নব ঘন নবীন মেঘ হেরে।
নয়ন চকোর ফিরে নারে, শশীর দর্প হরে।
ওগো চপলা চারু, কিরণ হেরে—
গগন বিধু লুকায় লাজে
বিধু যায়, ভুবন ত্যজে, গগন মাঝে।
লুকায়ে লাজে।

তারপর গীত হয় ভুকের অংশ—

রামের বাহু কণ্ঠ মূলে, মণিমাণিক্য হার দোলে
হায়, হেলে দুলে হায়, লুটাতে চায়—
রামের চরণ মধু পিব বলে—

রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধে চলেছেন। সেই সময়কার সুর, ছন্দ, কথা ভিন্ন ধরনের—

বাজনা বাজিছে গো সমর সাজে
ঝিমিকি ঝিমিকি বাজে, মহাবীর রণসাজে
মেদিনী কাঁপিছে গো বাজনার তেজে।

গানে গানে সংলাপ, যেমন রাণী মন্দোদরীর ভাবে ভাবিত হয়ে গায়েন বলে চলেন,—

প্রাণনাথ আপনি এখনও শ্রীরামচন্দ্রকে চিনতে পারেন নি। শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম, নারায়ণের অবতার আর সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী; গায়েন এবার গান করেন,—

কহে রাণী মন্দোদরী হরিলে রামের নারী
কারো কথা না শুনিলে কানে
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া হরি, জন্মিলেন জটাধারী
পূর্ণ ব্রহ্ম অযোধ্যার ভুবনে।

রাবণ রাজা গায়—

আমায় কি বুঝাবে গো মন্দোদরী রাণী
আমি জেনে শুনে এনেছি রাম ঘরণী,
সীতা এনে অশোক বনে রেখেছি পরম যতনে
বংশ উদ্ধারিবার তরে রাম ঘরণী গো।

রামচন্দ্র দশভুজার পূজা করলেন। গায়েন ধরেন শ্রীরামচরিতের গান,—

ওমা ভব ভয়-হারিণী
কেন বিরূপ গো ভবানী?
কি করিলে হয় রমা
আমি কি তোর পুত্র নই মা?
তবে কেন নিদয় শ্যামা
একি উচিত তোর হল তারিণী।

দশভুজা আবির্ভূতা হন। বর দান করেন। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে গণৎকার সেজে রাবণের মৃত্যুবাণের সন্ধান করে আনেন। রাবণ বধ হয়।

পদকর্তা পালা গানের শেষে দশাবতার শ্লোক বলেন,—

প্রলয় কালে পয়োধি জলে বেদ উদ্ধারিলে
কেশব করুণারি কৃপাময় হরি,
নম মীন অবতার।

দর্শকবৃন্দ রাবণের মৃত্যুতে পাপের ক্ষয়, শ্রীরামচন্দ্রের জয়ে পুণ্যের জয় দেখে বাড়ি ফেরেন।[২৩]

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের বাণে লক্ষ্মণ ক্ষত-বিক্ষত। প্রাণের আশা তাঁর নেই। শ্রীরাম রোদন করেন, তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের মৃত্যু আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়েন।

রামচন্দ্র বলেন,—

রাজ্য ধনে কাজ নাই নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে।

সুষেণ শ্রীরামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দেন,—

সুষেণ বলেন প্রভু না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
সুষেণ বলেন শুন পবন নন্দন।
ঔষধ আনিতে যাহ সে গন্ধমাদন॥[২৭]

নদীয়া জেলার লোকসঙ্গীতে 'রামায়ণ গানে' কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মণ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি; রামচন্দ্র লক্ষ্মণের আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কায় বেদনা হত। সুষেণ তখন পবননন্দন হনুমানকে গন্ধমাদনে ঔষধ আহরণের পরামর্শ দেন। শ্রীরাম গভীর চিন্তায় মগ্ন।

শ্রীরাম বলেন পথ আঠার বছর।
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিতর॥

নদীয়ার লোকসঙ্গীত : রামায়ণ গান

ছয় শৃঙ্গ ধরে তা অদ্ভুত নির্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গে উদয় করে শশধর॥
দ্বিতীয় শৃঙ্গে রহে শাল পিয়াল।
তৃতীয় শৃঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র চলে পালে পাল॥
চতুর্থ শৃঙ্গে আছে খরস্রোত নদী।
নদীর দুকূলে আছে বিস্তর ঔষধি॥
নীলবর্ণ মূল যার্দা. তার হিঙ্গুল বর্ণ লতা।
রক্তবর্ণ ডাঁটা তার স্বর্ণ বর্ণ পাতা॥
এ-হেন ঔষধি হনু শুন দিয়া মন।
রাত্রির ভিতরে যাবর আসিলে
বাঁচিবে লক্ষ্মণ॥[২৮]

—চকবিহারী, নদীয়া।

প্রথমেতে অঙ্গদ কপি করে আগুয়ান।
শত বাণে রাবণ তারে করে খান খান।
তার পরেতে সুষেণ বৈদ্য
হইল আগুয়ান।
দুশত বাণেতে তারে করে খান খান॥

ক্রোধ ভরে রাবণ বাণ করে বরিষণ।
পলাইল বানর সৈন্য ছাড়িয়া সংগ্রাম॥
বানর ভঙ্গ দিল রথ চালাইল দক্ষিণে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কাছে দিল দরশন॥২১

—চক্রবিহারী, নদীয়া।

প্রবাদ

রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

(১) ভাইয়ে ভাইয়ে অন্তরঙ্গতা বেশী,
রাম লক্ষ্মণ দুটি ভাই, রথে চড়ে স্বর্গে যাই॥

(২) ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব যেমন,
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি॥

রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্র।

(ক) বিভীষণ।
(১) রামায়ণে বিভীষণ ধর্মপ্রাণ;
(২) ঘর শত্রু।
(৩) পক্ষম বাহিনী।

(খ) দ্রৌপদী।
(১) পঞ্চস্বামী যার।
(২) ভাল রাঁধুনী।
(৩) বহু বল্লভা

ভাই যেমন চরিত্রের—ভগ্নীও তেমনি।

আমার ভাই রাবণ রাজা
আমি সূর্পণখা।
ধরা যাবে এমন জোড়া
পারিস যদি দেখা॥

পৌরাণিক ঘটনা, বস্তু ও ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে বহু প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশ আজও লোকসাহিত্যে প্রচলিত আছে।

(১) একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর।
(২) আজ মরে লক্ষ্মণ, ওষুধ দেব কখন।

(৩) রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে।

(৪) এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ।

(৫) রাম না হতে রামায়ণ।৩০

(৬) এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ।

(৭) সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কার ভার্যা।

(৮) কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

(৯) কোথা রাম রাজা হবে কোথা রাম বনবাস যাবে।

(১০) বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেঁট।

(১১) সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

(১২) যাহা রাম, তাঁহা অযোধ্যা।

(১৩) যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।

(১৪) একে হনুমান, তাতে আবার রামের বাণ।

(১৫) লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জলে মরি।

(১৬) মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।

(১৭) রাবণের দোষে সমুদ্র বন্ধন।

(১৮) রামের বাণে মরি সেও ভাল,
বাঁদরের দাঁত খিঁচুনি সয় না।

(১৯) রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

(২০) দেবর লক্ষ্মণ।

(২১) ঘরের শত্রু বিভীষণ।

(২২) লঙ্কায় সোনা সস্তা, তঙ্কায় তিন বস্তা।

(২৩) লঙ্কায় গেলেন হরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরিদ্রা।

(২৪) লঙ্কা বহু দূর।

(২৫) লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হল।

(২৬) লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের সোনা।

(২৭) কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা।

(২৮) রাবণের পুরী ছারখার।

(২৯) ঘর সন্তানে রাবণ নষ্ট।

(৩০) যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

(৩১) যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা।

(৩২) সীতা হারা হয়ে রামের বাঁদরে আদর।

(৩৩) রাজ্য পেল রামচন্দ্র, কলা খেল যত বান্দর।

(৩৪) এই যদি তোর ছিল মনে, তবে সাগর বাঁধলি কেনে।[৩১]

মহাভারত বিষয়ক

(১) যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে।

(২) মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

(৩) সখা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কে সাজে রণ?

(৪) বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার।

(৫) অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।

(৬) ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হবে রথী।
চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি॥

(৭) যুদ্ধে দ্রোণ, কথায় বল।

(৮) এক পা'লি ধানে মহাভারতে।

প্রবাদে বাক্যাংশ

(১) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড।

(২) লঙ্কা কাণ্ড।

(৩) কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

(৪) কুন্তার মরণ।

(৫) খাণ্ডব দাহন করা।

(৬) ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

(৭) দাতা কর্ণ।

(৮) শকুনি মামা।

(৯) দেবর লক্ষ্মণ।

(১০) দুর্যোধনের মত জলস্তম্ভ করে থাকা।

(১১) লক্ষ্মণের ফল ধরা।

(১২) পিতামহ ভীষ্ম।

(১৩) ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

(১৪) ব্যাসকাশী।

(১৫) শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ।

(১৬) রামের হনুমান।

(১৭) রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি।

(১৮) রাবণের চিতা।

(১৯) রাবণের স্ত্রী।

(২০) রাম-রাবণের যুদ্ধ।

(২১) দুর্যোধনের মরণ।

(২২) রাবণের বোন সূর্পণখা।

(২৩) রামরাজা।

(২৪) হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ।

(২৫) কুরুক্ষেত্র ব্যাপার।

(২৬) পরশুরামের কুঠার।

(২৭) গন্ধমাদন আনা।

(২৮) কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ।

(২৯) জটায়ু পাখীর পথ গেলা।

(৩০) লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

প্রবাদে—জাতীয় ইতিহাসের টুকরো :

কুক্তিবেশে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে,
এই তিন সর্বনেশে।

চারটি একাদশী (শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্তন ও ভীম) আর শিব-চতুর্দশী ও দুর্গাষ্টমী পালন সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে। এই সব প্রবাদে অতীত স্মৃতি বা লোকাচারের চূর্ণ অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত,—

শয়ন উত্থান, পাশমোড়া,
তার মধ্যে ভীম ছোঁড়া।
ফেণার চোদ্দ, ফেণীর আট,
এই ধরে বছর কাট॥

প্রবাদে রামকথা ও ভারতকথার প্রভাব ও পরিবর্তিত রূপ :

(১) অকাল কুষ্মাণ্ড :

—ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কুষ্মাণ্ড রূপে জন্মের কাহিনী থেকে।

(২) অজগরের দাতা রামচন্দ্র।

—স্থাণুবৎ নিশ্চল অজগরের আহারের উপায় করেন ভগবান,

—রামচন্দ্র।

(প্রবোধ চন্দ্রিকা, ২য় স্তবক, ৫ম, কুসুম)।

(৩) অতিদর্পে হত লঙ্কা।

—অতি দর্পে রাবণ মলো।

(৪) অযোধ্যার বন্ধু, বাঁশবনের ধুধু।

(৫) অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।

কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণ পর্বে আছে,—

'কহেন ধর্মের সুত অশ্বত্থামা হইল হত।

ইতিগজ এই কথা ভাসে॥'

(ক) কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে,—

আত্মচ্ছিদ্র না জানিয়া পরকে নিন্দ খোঁটা।

(খ) কাশীদাসী মহাভারতে,—

পরে নিন্দ নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।

রামচন্দ্র ও রাবণকে কেন্দ্র করে প্রবাদের বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ্য করা যায়।

রাম

(১) রাম-খোদা, ('বিপদে মানুষ রাম ও খোদাকে স্মরণ করে)।

(২) রাম নাম মুখে, ছুরি বেঁধে বুকে।

(৩) রাম না হতে রামায়ণ।

(৪) রাম পাখী, (মুরগী):

(৫) রাম ভক্তি কি রহিম ভক্তি।

(৬) রাম রাজ্য।

(৭) রাম রাবণের লড়াই।

(৮) রামায়ণের মধ্যে বানরের কচকচি।

(৯) রামে মারলেও মারবে,

রাবণে মারলেও মারবে।

(১০) রামের কুড়ে, লক্ষ্মণের কুড়ে

কিসের কুড়ে মোর গেল উড়ে।

(১১) রামের হনুমান।

রাবণ

(১) রাবণ মুখী হয়ে ভেঙে যাওয়া

(২) রাবণের পুরী বা রাবণের সংসার।

(৩) রাবণের চুলো।

(৪) রাবণের চিতা।

(৫) রাবণের দোষে হয় সমুদ্রবন্ধন।

(৬) রাবণের পুরী ছারখার।

(৭) রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি।

(৮) রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ ৩৫